দাদার কীর্তি

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

1..........2

2..........13

3..........23

4..........36

5..........55

6..........61

7..........71

8..........81

1

না, দাদা, তোমার বিয়েটা না হলেই নয়।

অভ্রভেদী গাম্ভীর্য রক্ষা করিবার জন্য দাদা টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া চেয়ারের উপর আড় হইয়া বসিলেন। চক্ষু অর্ধমুদ্রিত করিয়া বলিলেন, হুঁঃ, নিজের চরকায় তেল দে।

আমি বলিলাম, তেল আর পাব কোথায়। তেলগুদোমের চাবি যে মশায় হস্তগত করে রাখলেন! তুমি না পার হলে আমার যে কোন ভরসাই নেই।

দাদার এত যত্নে রক্ষিত গাম্ভীর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার দশনপংক্তি আর আত্মগোপন করিতে পারিল না। তথাপি আনন্দ যথাসাধ্য সংযত করিয়া দাদা বলিলেন, তোর তো বৌ অনেকদিন থেকেই ঠিক হয়ে আছে। তুই কেন আগেই বে করে নে না? আর সব তাতেই তো আমাকে এগিয়ে আছিস, বিয়ের বেলাই বা পেছিয়ে থাকবি কেন? দাদার শেষ কথাগুলিতে একটু গোপন অভিমানের জ্বালা ছিল।

আমার এই দাদাটির একটু পরিচয় আবশ্যক। ইনি-শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়—আমার খুড়তুত ভাই। বয়সে আমার অপেক্ষা প্রায় আড়াই বৎসরের বড়; বি. এ. পড়েন। উপর্য্যুপরি কয়েকবার ফেল হইয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহাকে ছাড়াইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছি।

এইখানেই বলিয়া রাখা উচিত যে পশ্চিমের কোন শহরে আমাদের বাস। পরিচয় গোপনার্থ শহরের নাম বলিলাম না। বাবা এখানে জেলা কোর্টে ওকালতি করেন। আমি তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র—এখনো ছাত্রজীবন শেষ করি নাই-কিন্তু প্রায় তোরণদ্বরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। বলা বাহুল্য, যে কলেজে পড়ি তাহা স্থানীয়।

কাকাবাবু সুদূর মাইশোরে চাকরি লইয়া পড়িয়া আছেন। দাদা এতকাল কলিকাতায় মেসে থাকিয়া কলেজে পড়াশুনা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনবার পরীক্ষা দিবার পরও যখন সংবাদপত্রের পাসের তালিকায় তাঁহার নাম পাওয়া গেল না। তখন কাকাবাবু তাঁহাকে কলিকাতার দূষিত জলহাওয়া হইতে দূরে লইয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু মাইশোরে লইয়া যাওয়া তাঁহার ইচ্ছা নয়; তাই বাবার তত্ত্বাবধানে দাদাকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। সেই অবধি-অর্থাৎ প্রায় দেড় বৎসর কাল দাদা এখানে থাকিয়া পাঠকার্য নির্বাহ করিতেছেন।

আমাদের দুইজনের মধ্যে সম্বন্ধটা ঠিক যে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত নয় তাহা বোধহয় পাঠক বুঝিয়াছেন। নির্দোষ হাস্য-কৌতুক আমাদের মধ্যে নিয়তই হইয়া থাকে। উপস্থিত দাদার পড়িবার ঘরে বসিয়া আমাদের উল্লিখিত কথাবার্তা হইতেছিল।

আমি বলিলাম, উঁহু, সেটি হচ্ছে না।

তুমি চলবে খুঁড়িয়ে, আমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে।

ইচ্ছে হবে প্রজাপতির মাথাটা দি গুঁড়িয়ে।

আমার বিয়ে যখন পুরোনো হয়ে যাবে তখন তুমি নতুন বিয়ে করবে-তা হবে না। জানতো, দাম্পত্য জীবনে উড়ে চলার চেয়ে খুঁড়িয়ে চলা ঢের বেশী লাভজনক।

দাদা নিরাশকণ্ঠে বলিলেন, কিন্তু ভাই, বাবা যে বলেছেন। পাস না করতে পারলে—

বাধা দিয়া বলিলাম, কাকাবাবুর ওই এক কথা। পাস করাটাই কি জীবনের একমাত্র পরমার্থ নাকি? মনে কর, তুমি ইহজন্মে। যদি পাস নাই করতে পার—তাহলে তোমার বিয়ে হবে না। যিনি তোমার জন্য আজন্ম শিবপুজো করছেন তাঁর সমস্ত ফুল বিশ্বপত্র ব্যর্থ হয়ে যাবে?

দাদা পূর্ববৎ বিমর্ষভাবে বলিলেন, কি করব ভাই, উপায় নেই।

আমি বলিলাম, উপায় নেই? আলবৎ আছে।

দাদা চেয়ার হইতে পা নামাইয়া আমার প্রতি গাঢ় দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, দ্যাখ সন্তোষ, চিরকালই আমি তোর বুদ্ধির পক্ষপাতী। একথা স্বীকার করতেই হবে যে সাধারণের চেয়ে তোর বুদ্ধি ঢের বেশী।

বিরসকণ্ঠে আমি বলিলাম, আমারও তাই মনে হয় বটে।

দাদা আগ্রহাতিশয্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কি করবি বলতো— বলিতে বলিতে আমার অধরপ্রান্তে একটু হাসি দেখিয়া সহসা হতাশ হইয়া বললেন, কিন্তু তুই সত্যি বলছিল তো? না শুধু ঠাট্টা হচ্ছে?

আমি গম্ভীরকণ্ঠে বলিলাম, আমি কখনো তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করি!

আশ্বস্ত হইয়া দাদা পুনরায় আরম্ভ করিলেন, আচ্ছা কি করা যায় বলতো? জেঠাইমাকে গিয়ে বল। নাঃ, ঠিক হয়েছে! মাকে এই বলে চিঠি লিখি যে আমার এ পৃথিবীতে আর থাকবার ইচ্ছে নেই-আমি সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাব যদি-

আমি হাসিয়া বলিলাম, দুর। পাগল বলবে যে। আমি উপায় করতে পারি। যদি একটা কথা তুমি আমায় বল।

সাগ্রহে দাদা বলিলেন, কি কথা!

না, সে তুমি বলবে না।

বলব বলব। তুই বলনা কি কথা!

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, আমি উপায় করতে পারি। যদি তুমি বল কাকে বিয়ে করবার জন্যে তোমার এত আগ্রহ।

দূর শূয়ার- বলিয়া সলজ্জ আনন্দ অব্যক্ত রাখিবার জন্য দাদা অধর কামড়াইতে কামড়াইতে অধোমুখে রহিলেন। শূয়ার—ছুঁচো-র্যাসকেল প্রভৃতি আখ্যাগুলি দাদা খুব প্রীতির তিরস্কারের সময় ভিন্ন ব্যবহার করিতেন না।

ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিলাম গতিক ভাল নয়। দাদা একটু সৌখীন প্রকৃতির লোক-হঠাৎ • সৌখীন রকম একটা প্রেমে পড়িয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

আমি বলিলাম, তাহলে আর কি করা হবে! তুমি এই তুচ্ছ কথাটা বলে আমায় বিশ্বাস করতে পার না, আর আমি তোমার জন্য উপায় করব! আমার কি বয়ে গেছে! কৃত্রিম কোপে আমি মুখ ফিরাইয়া লইলাম।

দাদার উভয়-সঙ্কট। তাঁহার মুখের বিচিত্র ভাববিকাশ দেখিয়া আমার পেটে হাসি যতই উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল, আমি বাহিরে ততই গভীর হইতেছিলাম।

মাছ টোপ গিলিল। মাছ টোপ গিলিবার জন্য ছটফট করিতেছিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দাদা বলিলেন, তুই যদি কাউকে না বলিস

বলব না।

না তুই বলে ফেলবি।

আমি বলিলাম, না গো না। এইমাত্র তো তুমি স্বীকার করলে যে, তোমাদের চেয়ে আমার বুদ্ধি বেশী। তোমার কম বুদ্ধির চাপ ঠেলে যখন কথাটা প্রকাশ হয়নি তখন আমার বেশী বুদ্ধির বস্তার তলায় পড়ে ওটা অচিরাৎ সমাধিস্থ হবে জেনো।

তথাপি দাদা ইতস্তত করিয়া বলিলেন, না ভাই, তুমি কিন্তু রাগ করবে।

আমি বলিলাম, দেখ, রাগ জিনিসটা ভগবান আমায় কম দিয়েছেন-সেজন্য আমি দুঃখিত।

আমি শপথ করে বলছি। রাগ করব না, এমনকি তুমি যদি আমার ভবিতব্য শ্রীমতী বীণাপাণিকে উদ্বাহ বন্ধনে বদ্ধ করতে চাও তাহলেও না।

দাদা বোধহয় সম্বন্ধের পূর্ব হইতেই আমার ভবিষ্যৎ গৃহিণীকে ভাদ্রবধু জ্ঞান করিতেন। তিনি আমার দিকে মুষ্টি তুলিয়া বলিলেন, সে কেন, ছুঁচো কোথাকার। তাঁর বড় এক বোন আছে জানিস তো?

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলাম, অ্যাঁ, সরস্বতী! রগ ঘেঁসে আন্দাজ করেছি তাহলে? আরে হাঃ হাঃ হাঃ–

দাদা বিষম অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, আমি বললুম তুই রাগ করবি।

আমি বলিলাম, রাগ করলে বুঝি লোক হাসে? বেশ যাহোক। কিন্তু তোমার এই রোমহর্ষণ প্রেমের সূত্রপাত হল কি করে শুনি। সরস্বতীর মত একগুঁয়ে মেয়ে শহরে আর দুটি নেই।

শুনিয়া দাদা নয়ন অর্ধনিমীলিত করিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িয়া মৃদুকণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন,-

I know not I ask not
If guilt is in that heart.
I know that I love thee
Whatever thou art!

[আমি জানি না, জানতে চাই না তোমার হৃদয়ে কোন দোষ আছে কিনা। আমি জানি, আমি তোমায় ভালবাসি-তুমি যাই হও।]

আমি তো স্তম্ভিত। বুঝিলাম দাদার অবস্থা ঘোর সঙ্কটাপন্ন। কবিতাই প্রেমের চরম নিদর্শন। দাদার প্রেম যে জমিয়া হিমাদ্রি শিখরের মত শক্ত হইয়া গিয়াছে তাহাতে আর লেশমাত্র সন্দেহ রহিল না।

আমি বলিলাম, তুমি যে রকম কবিতা আওড়াচ্ছ, তোমাকে আমাদের কোটেশন ক্লাবের (Quotation Club) মেম্বার না করলে আর চলছে না। কিন্তু উপস্থিত আমার প্রশ্নের জবাব দাও। তোমার এই প্রেমের সূত্রপাত কি করে হল বল।

দাদা বলিলেন, না, আগে উপায় কি বল।

আমি বলিলাম, খুব সোজা! আমি বৌদিকে দিয়ে মাকে জানাব যে আমার বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়েছে। এতদিন অমত করে এসেছি-মা নিশ্চয় খুব তাড়াতাড়ি করবেন। অথচ তোমার বিয়ে না। হলে আমার কিন্তু বিয়ে হতে পারে না।

মন্ত্রণা শুনিয়া দাদা চমৎকৃত হইয়া গেলেন। লাফাইয়া আসিয়া আমার সঙ্গে সজোরে শেকহ্যান্ড করিয়া বলিলেন, সত্যি সন্তোষ, তোকে আর কি বলব। কিন্তু ভাই, তার সঙ্গেই যে হবে

আমি বলিলাম, কিছু ভেবো না দাদা। আমাদের বৌদি থাকতে কিসের ভাবনা। তাঁকে বললেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

দাদার মুখে-চোখে কি এক অনির্বচনীয় প্রীতি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। আমি তাঁহার কনিষ্ঠ না। হইয়া যদি জ্যেষ্ঠ হইতাম তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ আমায় গড় হইয়া প্রণাম করিতেন সন্দেহ নাই।

আমি বলিলাম, এবার তোমার প্রেমের কাহিনী বল।

দাদা আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। কেশারণ্যের মধ্যে বীথির ন্যায় সিঁথির ভিতর দিয়া সন্তপণে অঙ্গুলি চালনা করিয়া আরম্ভ করিলেন, আমি একদিন কলেজ যাচ্ছি

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, নিশ্চয় সেদিন খুব গরম ছিল আর ছাতাটাও বোধ করি নিতে ভুলে গিয়েছিলে?

দাদা বলিলেন, না, গরম তত ছিল না। কেন?

আমি বলিলাম, তারপর–

তারপর আমি ওঁদের বাড়ির সুমুখ দিয়ে যাচ্ছি।-দেখি উনি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে (দাদার কণ্ঠস্বর সম্ভ্রমে গাঢ় হইয়া আসিল) ফেরিওয়ালার কাছে জিনিস কিনছেন। তিনি বাঁ হাতে নাকের নোলকটি ধরে নাড়ছিলেন। আর এমন একটি কমনীয় শ্রী তাঁর সর্বঙ্গ থেকে ফুটে বার হচ্ছিল যে সে বর্ণনা করা যায় না। তোমায় আর কি বলব। কবি মানুষ, মানস চক্ষে কল্পনা করে নাও।

আমি বলিলাম, হুঁ, ফেরিওয়ালার সঙ্গে দরসস্তুর করতে করতে তাঁর অঙ্গে কমনীয় শ্রীর আবির্ভাব হয়েছিল। তুমি ঠিক জান তিনি ফেরিওয়ালার প্রেমে পড়েননি?

দাদা রাগিয়া বলিলেন, দুর র‍্যাসকেল, সে একটা বুড়ো—

আচ্ছা আচ্ছা, তবে ভরসা আছে।–তারপর? তিনি কি করছিলেন?

দাদা বলিলেন, একখানা আরসি কিনছিলেন। বোধহয় পছন্দ হয়নি। তাই সেখানা ফেরৎ দিচ্ছিলেন। তাঁর মুখের রক্তিম আভা—

আমি। আরসি ফেরৎ দিচ্ছিলেন-মুখে রক্তিম আভা? বুঝেছি। তা সত্যি কথা বলেছিল বলে আরসিখানার উপর রাগ করা অন্যায়। শাস্ত্রে আছেহিতং মনোহারি চ দুর্ল্লভং বচঃ।

দাদা স্মিতমুখে বলিলেন, তিনি যে সুন্দরী একথা তুমি অস্বীকার করতে পার না।

আমি। বেশ বেশ, পারি না। তারপর কি হল বল।

দাদা। পকেটে হাত দিয়ে দেখি এক ফুটোর সাহায্যে আমার পেনসিলটি কখন রাস্তায় বিদায় গ্রহণ করেছে। কি করা যায়। কলেজে রাশি রাশি নোট লিখতে হবে। মনিব্যাগ থেকে দুটো পয়সা নিয়ে তৎক্ষণাৎ ফেরিওয়ালা বেটার সুমুখে হাজির।

আমি। অ্যাঁ, বল কি।

দাদা। যা বলছি। তিনি ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন—

আমি। ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন?

দাদা। নিমেষের জন্য। আমাকে তিনি নিশ্চয় আগে দেখে থাকবেন তাই হঠাৎ চিনতে পেরে চলৎশক্তি রহিত হয়ে পড়েছিলেন। পরীক্ষণেই আরক্তিম মুখে চকিতের তরে একবার চেয়েই দ্রুতপদে সেখান থেকে চলে গেলেন।

আমি সুদীর্ঘ একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলাম, দাদা, তুমি গোড়াতেই ব্যাপারটাকে যে রকম করে ফাঁসিয়ে দিয়েছ তাতে তোমার বিশেষ ভরসা আছে বলে বোধ হচ্ছে না। সরস্বতী এমন মেয়েই নয়-কারুর এতটুকু ত্রুটি সে কখনো সহ্য করতে পারে না। সত্যিই তোমার জন্যে ভারী সহানুভূতি হচ্ছে।

2

একটি ক্ষুদ্র একতলা বাড়িতে আমাদের ক্লাব। চারিটি ঘর এবং দুইটি বারান্দা বেষ্টন করিয়া ছোট কম্পাউন্ড। তাহাতে ব্যাডমিন্টন খেলিবার ব্যবস্থা আছে। আমরা প্রায় আট-নয়জন বাঙ্গালী এই ক্লাবের মেম্বার। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহার নাম রাখিয়াছি কোটেশন ক্লাব (Quotation Club)। আমরা এখানে যথাসম্ভব কোটেশনে কথা কহিয়া থাকি, স্ব স্ব রচনা আপনাদের মধ্যে পড়িয়া শুনাই, সাময়িক সাহিত্য, দৈনিক সংবাদপত্রের সমালোচনা করি, গান গাহি এবং যথেচ্ছ গল্প করি। কিন্তু আমাদের সভার উদ্দেশ্য উল্লিখিত বিষয়গুলি অপেক্ষাও মহৎ। আমরা প্রয়োজন এবং সাধ্য হিসাবে পরোপকারও করিয়া থাকি। স্কুলের কোন ছাত্র শিক্ষকভাবে পড়িতে না পাইলে আমরা তাঁহাদের বিদ্যাদান করি এবং লোকাভাবে মড়া স্থানান্তরিত না হইলে সে ভারও নিজ স্কন্ধে বহন করি।

ক্লাব সম্প্রতি গঠিত হইয়াছে। আমরা সকল মেম্বারই উদ্যোগী। আমাদের কাহারও কাহারও নাম এখন না হোক অন্যত্র পাঠক-পাঠিকার প্রয়োজন হইতে পারে, এই জন্য উদ্ধৃত করিলাম। যথা-সন্তোষ (সভাপতি), অমূল্য (সম্পাদক), অনাদি, চুনী, প্রভাত, বরদা, হৃষী ও পৃথ্বী। ভবিষ্যতে আরও একনিষ্ঠ মেম্বারের প্রত্যাশা রাখি।

সন্ধ্যার সময় আমাদের ক্লাব বসিত। সেদিন যথাসময় উপস্থিত হইয়া দেখি বাহিরের অন্ধকারে কে একজন চেয়ার পাতিয়া বসিয়া আছে। আরও অনেকের কণ্ঠস্বর ঘরের

ভিতর হইতে আসিতেছিল। বাহিরে যে বসিয়াছিল তাহার উদ্দেশ্যে বলিলাম, কে? Who's there?

উত্তর। Nay answer me. Stand and unfold thyself.

আমি। God save the Quotation Club.

উত্তর। সন্তোষ?

আমি। He.

অমূল্য কহিল, কিহে, আজ যে গেট পার হতে না হতেই কোটেশনের ছুঁচোবাজি ছেড়ে দিলে। আমি একটা চেয়ার বাহিরে আনিয়া তাহারপাশে বসিয়া বলিলাম, কি ভাবিছ মনে মনে?

অমূল্য। ভাবছি আমি কবিতা লিখলে কেমন মানায়।

আমি। লিখেছ নাকি?

অমূল্য। এক stanza.

আমি। কি শুনি।

অমূল্য। শোন,

জনম অবধি কার তোমা’পরে অধিকার
প্রিয় বলে ডাকিবার দিয়াছেন বিধি,
জানি না গো আমি তাহা তবু ভাবি যদি আহা
পাইতাম তোমা হেন অলকার নিধি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি বিষয়?

অমূল্য বলিল, সেইটে এখনো ঠিক করতে পারিনি। যাক গে, এখন তোমার সংবাদ?

আমি। মন্দ নয়। কিন্তু আমার কেদারদাদার সংবাদ বড়ই আশঙ্কাজনক। তাঁর সম্বন্ধে
I could a tale unfold
Whose lightest word would–

অমূল্য। খুলে বল, খুলে বল।

আমি। অকস্মাৎ দাদা প্রেমে পড়ে গেছে।

অমূল্য উৎসুক হইয়া বলিল, কার সঙ্গে?

আমি আদ্যোপান্ত বিস্তারিত বর্ণনা করিলাম। দিনান্তে অমূল্যর কাছে মনের সমস্ত কথা না বলিলে আমার চলিত না। তাহার সহিত আমার বন্ধুত্ব অবিচ্ছেদ্য।

সে শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল, একটা কাজ করলে হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কাজ?

ভাবিতে ভাবিতে অমূল্য বলিল, বলব?

আমি অধীর হইয়া বলিলাম, বল না।

অমূল্য তখন তাহার মতলব প্রকাশ করিয়া বলিল। উপসংহারে কহিল, তোমার দাদা যে রকম বেকুব, বুঝতেও পারবে না যে এর মধ্যে কোন কারচুপি আছে। তার ওপর দেখ কোটেশন ক্লাবের উদ্দেশ্য শুধু পঞ্চমুখ হয়ে কথা কওয়া নয়। আমাদের ক্লাবের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম। তোমার কেদারদাদা যদি এ সময় প্রেমচাঁচায় মনোনিবেশ করে তাহলে নিশ্চয় জেনো এবার সে পরীক্ষায় কার্যত স্থিতিশীলতার পরিচয় দেবে। আমাদের উচিত হচ্ছে তাকে ফিরিয়ে আনা।

আমি বলিলাম, কিন্তু ভাই, বিয়ে তো একদিন সকলকেই করতে হবে।

অমূল্য বলিল, আমি কি তাতে না বলছি। বিয়ে করে স্ত্রীর সঙ্গে অনর্গল প্রেম কর-যা লোকে আবহমান কাল করে এসেছে। কিন্তু এ কি? বিয়ের আগেই প্রেম! সত্যি কথা বলবি ভাই, এরকম সাহেবিয়ানা আমার সহ্য হয় না। যে লোক বিয়ে করবার আগেই কোনও মেয়েকে ভালবাসে অথবা মনে করে ভালবাসি, আমি বলি তার হৃদয় দুর্বল। নিজের মনের ওপর তার শাসন নেই। শক্তি আছে তার হৃদয়ে যে নিজের স্ত্রীকে মনের মত করে নিয়ে ভালবাসতে পারে। কিন্তু কেদারের মত লোকের পক্ষে-যে গোঁফ উঠে অব্দি প্রেমের নেশায় বিভোর হয়ে আছে-পাঠ্যাবস্থায় বিয়ে করা অত্যন্ত ক্ষতিকর।– তারপর, মনে কর, তোমরা ক্ষিতীনবাবুর কাছে প্রস্তাবটা উপস্থিত করলে।

তিনি যদি বলে বসেন, আমি ওই তিন-বছর-ফেল-করা ছেলেকে মেয়ে দেব না। কি দেখেই বা দেবেন। ক্ষিতীনবাবুর মত বুদ্ধিমান লোক টাকা দেখে। কখনই মেয়েকে জলে ফেলে দেবেন না। আর চেহারার কথা যদি বল, ওইটেই তোমার দাদার আছে-চেহারায় পেট ভরে না। বিংশ শতাব্দীতেও পুরুষের রূপ অর্থকরী নয়। এই যে তোমার সঙ্গে উনি এক মেয়ের বিয়ে দিতে চাইছেন সে কেবল তোমার রূপ দেখে নয়। তোমার মত বিদ্বান, মেধাবী, সুবোধ পাত্র–

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, থাক, থাক, আর প্রশংসায় কাজ নেই। সুবোধই বটে। মারামারি গুণ্ডামি এবং ফুটবলে যে সুনাম কিনে রেখেছি!

অমূল্য উত্তেজিত হইয়া বলিল, সেই কি কম নাকি! কজন লোকের গুণ্ডামি মারামারি করবার সাহস আছে। বিশেষত বাঙ্গালীর? করুক না দেখি কেদার। কিন্তু যাক ওসব বাজে কথা। তুমি যদি উপস্থিত কেদারের প্রেমের প্রতিকার করতে রাজী না হও-আমি একাই করব।

আমি বলিলাম, না। আমি রাজী আছি। কিন্তু দেখো কথাটা জানাজানি না হয়।

পরদিনই আমরা দুই বন্ধুতে কাগজ কলম লইয়া নিভৃতে বসিয়া গেলাম। অনেক তর্ক অনেক কাটাকুটির বাধা ভেদ করিয়া আমাদের কবিতা প্রবাহ চলিল–

জনম অবধি কার তোমা পরে অধিকার
প্রিয় বলে ডাকিবার দিয়াছেন বিধি,
জানি না গো আমি তাহা তবু ভাবি যদি আহা
পাইতাম তোমা হেন অলকার নিধি।

তোমার বিহনে শুধু প্রাণ মোর করে ধুধু
যেন গো সিকতাময় নিদারুণ মরু—

আমি বলিলাম, এইবার মরুর সঙ্গে কি মেলানো যায়!

অমূল্য ভাবিতে ভাবিতে বলিল, গরু—মরু—

আমি হাসিয়া বলিলাম, থাক হয়েছে–

সুনিবিড় ছায়াদানে জুড়াও কাতর প্রাণে
তুমি এ সাহারা মাঝে সুশীতল তরু!

অমূল্য আপত্তি করিয়া বলিল, যাই বল, এর চেয়ে তুমি এ সাহারা মাঝে একমাত্র গরু ঢের ভাল শোনাত।

আমি। মানে হত কই?

অমূল্য। মানে হত না? এর মানে এই হত যে—আমার প্রাণ সাহারার মত, শুকনো, তাতে যে ক'গাছি ঘাস জন্মায় সে কেবল তোমারি জন্য, অন্য কোন গরু সে ঘাস খেতে পায় না।

এইরূপে অনতিক্ষুদ্র কবিতা শেষ হইল। তারপর একখানি এসেন্সের গন্ধে ভরপুর গোলাপী চিঠির কাগজে লাল কালি দিয়া লিখিত হইল।

লিপি লিখন শেষ হইলে আমি বলিলাম, অমূল্য, একবার ফিলিং দিয়ে পড়তে, দেখি কেমন শোনায়।

অমূল্য হরবোলা, সে ললনাকণ্ঠে চিঠি পড়িতে আরম্ভ করিল–

জনম অবধি কার তোমাপরে অধিকার
প্রিয় বলে ডাকিবার দিয়াছেন বিধি,
জানি না গো আমি তাহা তবু ভাবি যদি আহা
পাইতাম তোমা হেন অলকার নিধি।

তোমার বিহনে শুধু প্রাণ মোর করে ধুধু
যেন গো সিকতাময় নিদারুণ মরু,
সুনিবিড় ছায়াদানে জুড়াও কাতর প্রাণে
তুমি এ সাহারা মাঝে সুশীতল তরু।

প্রাণের গোপন কথা প্রকাশিছে ব্যাকুলতা
বাহির হইতে মায়া মোহ পরিহরি,
লেখনী সে বাধ-বাধ কথা কহে আধ-আধ
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছে সমর প্রহরী।

ভাঙ্গি সরমের বাঁধ মনের আকুল সাধ
গিরিজা তটিনী সম ধায় তব পানে,
তুমি মম হে সাগর, তুমি মম হে নাগর

হতাশা দিও না ঢেলে প্রোষিত পরাণে।

করিবারে দাসীপনা ভেবেছিনু বাসিব না
বিপুল এ ধরা মাঝে কাহারেও ভাল,
আঁধারে একটি দীপ আকাশে চাঁদের টীপ
সম তুমি এ হৃদয় করিয়াছ আলো।

তাই আজ যেচে এসে পড়েছি চরণ দেশে
জেনো মোরে এ জগতে বড় অভাগিনী,
নয়নে কিসের জ্বালা হৃদয়ে বিষের জ্বালা
কানে বাজে সকরুণ হতাশ রাগিণী।

প্রভাত আলোক মিশে বায়ু ধায় দিশে দিশে
কত কুসুমিকা তারে দিয়ে ফেলে প্রাণ,
পবন তো জানে না তা ফুল বোঝে নিজ ব্যথা
জানে সেই বুকে যার বিঁধে আছে বাণ!

তাই এই বাচালতা চপল চটুল কথা
আনমনে কতশত বাতুল প্রলাপ,
এই বলে ক্ষমা কর একটি কঠিন শর
ত্যজিয়াছে মোরে চাহি মদনের চাপ।

–একবার আসিও। তোমাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিব, মনের কথা বলিব। কাল রাত্রি নটার সময়; আমাদের বাড়ির পিছনে তেঁতুল গাছের নীচে।

ইতি
তোমারি আকাঙ্ক্ষিণী
যাহাকে ফেরিওয়ালার সঙ্গে দেখিয়াছিলে।

পাঠ শেষ করিয়া অমূল্য বলিল, তুমি থাকবে গাছের ওপর, আমি কিছু দূরে আড়ালে লুকিয়ে থাকব। তুমি জোরে শিস দিলেই আমি এসে রক্তাক্ত হস্তে আসামী গ্রেপ্তার করব।

তখনি দাদার নামে চিঠি পোস্ট করা হইল।

3

শহরের যে পাড়াটায় আমাদের বাস তাহা শহর-বাজার হইতে বেশ একটু দূরে বলিয়া সকল সময়েই বেশ নির্জন এবং কোলাহলশূন্য। আমাদের কয়েকটি বাঙ্গালী ভদ্রপরিবার লইয়া এই ক্ষুদ্র নিভৃত পাড়াটি গঠিত। স্থানটিও খুব মনোরম। পাড়ার গৃহগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দীর্ঘ ঋজু পথ চলিয়া গিয়াছে। পথের দুইধারে বড় বড় পুরাতন নবাবী আমলের গাছ পথটিকে ছায়ায় ঢাকিয়া রাখিয়াছে। বাড়িগুলির পিছনও বিস্তর পতিত জমির উপর ঐরূপ গাছ সুনিবিড় কাননের সৃষ্টি করিয়াছে।

ছেলেবেলায় এই তরুবীথিকার মাথার উপর কত স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে কত জ্যোৎসাপ্লাবিত নিশিতে কোকিল বারবার কুহরিয়া উঠিয়াছে শুনিয়াছি। কত অন্ধকার রাত্রে বাড়ির পিছনকার বনের দিকে তাকাইতে ভয় করিয়াছে। এখন সেই সব কথা মনে পড়ে। বৃদ্ধ লম্বিতজট বটগাছগুলাকে পথের পাশে সারি সারি দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মনটা শতবর্ষ পূর্বেকার কত অসংলগ্ন স্বপ্নে বিজড়িত হইয়া যায়।

বাড়ির পিছনে ফাঁকা জমি পড়িয়া থাকায় আর কিছু না হোক, বাড়ির মেয়েদের খুব সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহারা স্বচ্ছন্দে সকল সময় খিড়কি দিয়া এবাড়ি ওবাড়ি যাতায়াত করিতে পারিতেন।

এবার আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একটি পরিবারের পরিচয় দিব। ক্ষিতীন্দ্রবাবু পূর্বে সাবজজ ছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি কার্যে অবসর গ্রহণ করিয়া আজ সাত বৎসর এখানে ঘরবাড়ি করিয়া বাস করিতেছেন। আমাদের বাড়ির কয়েকখানা বাড়ি পরেই তাঁহার গৃহ।

ক্ষিতীন্দ্রবাবুর এক পুত্র অনিল, সেই জ্যেষ্ঠ। তাহার পরে দুই কন্যা-সরস্বতী ও বীণা। ক্ষিতীনবাবু যদিও সাত বৎসর কার্যে অবসর লইয়াছেন তথাপি তাঁহার স্বাস্থ্য খুব ভালই আছে। চুল এখনো অর্ধেক পাকে নাই। তাহার প্রধান কারণ বোধহয় এই যে তিনি এ–কায় বৎসর সাংসারিক সকল আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বেদান্ত চচা করিতেছেন। এ বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অসামান্য।

ক্ষিতীনবাবু যখন প্রথম এখানে আসেন তখন সরস্বতীর বয়স আট বৎসর এবং বীণার পাঁচ। প্রথম হইতেই আমাদের সঙ্গে ক্ষিতীনবাবুর পরিবারবর্গের খুব মাখামাখি হইয়া গেল। কিছুদিনের মধ্যেই মা ঠিক করিয়া ফেলিলেন যে বীণাকে তাঁহার বধু করিবেন। মার বিশ্বাস তাঁহার ফুটফুটে ছেলের পাশে এই টুকটুকে মেয়েটি দিব্য মানাইবে। অতএব সকলেই আমাকে বীণার ভবিষ্যৎ বর বলিয়া জানিত। এবং এ পর্যন্ত কোনদিক হইতেই এবিষয়ে কোন ওজর-আপত্তি উঠে নাই। সরস্বতী বেচারীর এ পর্যন্ত বর লাভ ঘটিয়া উঠে নাই। কেন জানি না। মেয়েটি বেশ-সময় সময় মনে হয় আমারটির মতই যেন সে ভাল। বলা বাহুল্য, ইহাকে দেখিয়াই আমার দাদাটি পুষ্পধন্বার কোপে পড়িয়াছেন।

আন্দাজ পৌনে আটটার সময় গিয়া সরস্বতীদের বাড়ির পিছনকার তেঁতুল গাছে উঠিলাম। গাছটা বড় নয়—অপেক্ষাকৃত খবাকৃতি। গাছে উঠিয়া জমি হইতে প্রায় দশ ফুট

উর্ধ্বে একটা মজবুত ডালের দুইদিকে পা ঝুলাইয়া বসিলাম। তারপর পিঠ আর একটা ডালে হেলান দিয়া নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট টানিতে লাগিলাম। দাদা চিঠি পাইয়াছেন দেখিয়াছি-অতএব নিশ্চয় আসিবেন। পাছে অস্থিরতা হেতু কিছু আগে আসিয়া পড়েন এই ভয়ে সকাল সকাল পাহারা আরম্ভ করিলাম। দাদাকে দেখিবামাত্র কিরূপে তাঁহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িব তাহা ঠিক করিয়া রাখিলাম। অমূল্য নিশ্চয় নিকটেই কোনখানে লুকাইয়া উৎকর্ণভাবে আমার শিসের প্রতীক্ষ করিতেছে। ফাঁদ প্রস্তুত, এখন শিকার আসিলেই হয়।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ অন্ধকারে বসিয়া মশা তাড়াইতেছি এমন সময় পদশব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। দেখি দুইজন লোক আসিয়া গাছের তলায় কয়েকটা চেয়ার রাখিয়া গেল। কিছু বুঝিতে পারিলাম না। পরীক্ষণেই ক্ষিতীনবাবু তাঁহার পুত্রকন্যা ও পত্নীর সহিত আসিয়া চেয়ারগুলি অধিকার করিয়া বসিলেন। আমি প্রমাদ গণিতে লাগিলাম। কি ভয়ানক! কে জানিত যে ইহারা এই সময় এই গাছের তলায় আসিয়া বসেন। যদি এই সময় ইহারা থাকিতে থাকিতে আমার বুদ্ধিমান দাদাটি আসিয়া দর্শন দেন তাহা হইলে কি হইবে ভাবিয়া আমি ঘামিয়া উঠিলাম। আমি যদি এই গাছের উপর ধরা পড়ি তাহা হইলে অবস্থাােটা কিরূপ দাঁড়াইবে মনে করিয়া আমার সবঙ্গে কাঁটা দিল। অসংখ্য মশা অবাধে আমাকে কামড়াইতে লাগিল, আমি হাত নাড়িয়া তাহাদের তাড়াইতে পারিলাম না। কি জানি, যদি শব্দ হয়। আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলাম-ভয়ে তালু পর্যন্ত শুকাইয়া কাঠ হইয় গেল। নিজের দুরবস্থা দেখিয়া নিজেরই কান্না আসিতে লাগিল।

গৃহিণী বিস্তর গল্প করিতে লাগিলেন। সংসারের কথা, বাহিরের কথা, মেয়েদের বিবাহের কথাও দুএকবার তুলিলেন। অনিল মাঝে মাঝে মার কথায় যোগ দিতে লাগিল।

রাত্রি যখন পৌনে নয়টা তখন ক্ষিতীনবাবু শেষ এক হাই তুলিয়া উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময় অনিলকে বলিয়া গেলেন, অনিল, তুমি এখন থেকে একটু করে বেদান্ত পড়।

ক্ষিতীনবাবুর সঙ্গে গৃহিণী এবং অনিলও উঠিয়া গেল। আমি মনে মনে কতকটা আশ্বস্ত হইলাম।

আর সকলে চলিয়া গেলে বীণা সরস্বতীর পাশের চেয়ারে গিয়া বসিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, দিদি, তুমি আজকাল কবিতা লেখা। আমায় দেখাও না তো

সরস্বতী। দেখাই না?

গভীর অভিমানের সুরে বীণা বলিল, কই দেখাও।

সরস্বতী অপরাধীর মত চুপ করিয়া রহিল। দিদি দোষ স্বীকার করিল দেখিয়া বীণার আর রাগ রহিল না। সে হাসিয়া বলিল, বুঝেছি, বরের কথা লেখা হয়। কিনা। ভালবাসার কথা যে বর ছাড়া আর কারও বিষয় হইতে পারে না। তাহা বীণা বিলক্ষণ জনিত।

সরস্বতী বলিল, মাথা নেই মাথাব্যথা। বলিস তো তোর বরের কথা লিখে দিতে পারি।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বীণা বলিল, হুঁঃ, কি লিখবে? তাহার কণ্ঠস্বরে লজ্জার সহিত কৌতূহলের যে একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল গাছের উপর থাকিয়াও আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম। সরস্বতী বলিল, প্রথমেই তাঁর রূপ-বর্ণনা করা যাবে। তার খানিকটা উদাহরণ শোন–

মুণ্ডখানি কেশমাত্র হীন রে
ইন্দ্রলুপ্ত অতীব মসৃণ রে
ব্যোমবৎ দিগন্তে বিলীন রে!
টিকিট বিশাল বৈজয়ন্তী রে
বর্ণ জিনি আসামেরি দন্তী রে
রাতকানা এমনি কিম্বদন্তী রে।

প্রকৃতপক্ষে আমার দিগন্তব্যাপী টাকিও নাই, টিকিও নাই, আসামের হাতির মত বর্ণও নয় এবং রাতকানার কিম্বদন্তীটা নিতান্তই ভিত্তিহীন। সরস্বতীর বর্ণনাটা যে আগাগোড়াই একটা মস্ত ভুল তাহা বোধকরি কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। কারণ যেখানে মুণ্ডখানি কেশমাত্রহীন, সেখানে বিশাল বৈজয়ন্তীর মত টিকির স্থান কোথায়। টাক কিছু টিকির জন্য সংস্থান রাখিয়া পড়ে না।

বীণা বরের এইরূপ বর্ণনা শুনিয়া চটিয়া গেল। কাহারই বা সহ্য হয়! বলিল, ওই রকম বুঝি? ভারি তো জান তুমি

সরস্বতী বলিল, না সবই তুই জানিস। তোর বর বলে শুধু তুই দেখিস আমরা তো দেখতে পাই না।–আচ্ছা বীণা, তাকে তো সেই কবে দেখেছিস, আজকাল তো বাড়ির ভেতরে আসেও না। কি করে জানালি যে সে ওইরকম হয়ে যায়নি।

বীণা বলিল, বাঃ, রোজ বাড়ির সুমুখ দিয়ে কলেজ যায়।

সরস্বতী। আর তুমি বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে তার মুখখানির ওপর দৃষ্টি দাও? দাঁড়াও না, কালই আমি তাকে সাবধান করে দিচ্ছি যেন এ রাস্তা দিয়ে আর কলেজ না যায়।

ধরা পড়িয়া গিয়া বীণা দিদির গলা জড়াইয়া ধরল। তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল, না ভাই দিদি! তাহার বোধহয় বিশ্বাস যে সরস্বতী সত্যসত্যই আমাকে ও-পথ দিয়া কলেজ যাইতে বারণ করিবে। করিলেও সে বারণ কতদূর গ্রাহ্য হইত বলা নিষ্প্রয়োজন।

সরস্বতী বলিল, বেশ ভাই দিদি, বরং তাকে বলে দেব যেন রবিবারেও কলেজ যায়।

রবিবারে কলেজ না থাকা যে কতদূর ক্ষতিকর তাহা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে লাগিলাম।

সরস্বতী বলিল, আচ্ছা বীণা, তুই যে এখন ভারি বর বর করে লাফাচ্ছিস (সরস্বতীর সস্নেহ কৌতুকের স্বর আরও স্নেহ-কোমল হইয়া আসিল) তুই যখন বিয়ে হয়ে বরের কাছে চলে যাবি, আমার জন্যে মন কেমন করবে না?

ঠোঁটফুলানো সুরে উত্তর হইল, করবে না বুঝি? মুহূর্তপূর্বের হাস্যোজ্বল চক্ষু যে জলে টলটল করিতেছে রাত্রির অন্ধকারেও তাহা আমার কাছে গোপন করিতে পারিল না।

সরস্বতী ছোটবোনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া একটি চুম্বন করিল। তারপর সেই ভাবে উভয়ে উভয়ের গলা জড়াইয়া বসিয়া রহিল। তাহাদের মনের মধ্যে যে গভীর ভালবাসার স্রোত বহিতেছিল কথা কহিয়া কেহ তাহাতে বাধা দিল না।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে থাকিয়া বীণা হঠাৎ সজোরে বলিয়া উঠিল, দিদি, একটা কাজ করলে হয়। না। কথাটা এরূপভাবে বলিয়া ফেলিয়াই আবার লজ্জায় চুপ করিয়া গেল।

সরস্বতী বলিল, কি কাজ?

কোনরূপে লজ্জা দমন করিয়া বীণা থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল, তুমি যদি ওর দাদাকে-ঐ যিনি নতুন এসেছেন তাঁকে বিয়ে কর—তাহলে কিন্তু—

সরস্বতী হাসিল, বলিল, তাহলে কিন্তু তোমার মুণ্ডু। তুই ভারি বোকা বীণা।

এরূপ অপবাদেও বীণা দমিয়া গেল না, বুদ্ধির পরিচয় দিয়া বলিল, কোন দিদি, দেখতে তো মন্দ নয়।

সরস্বতী বলিল, তোর বরের চেয়ে ভাল!

কথাটা বীণা স্বীকার করিল কিনা জানি না, কিন্তু বলিল, তবে কেন বিয়ে কর না।

সরস্বতী দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল, আমাদের সুর্য্যিয়া চাকরও তো তোর বরের চেয়ে দেখতে ভাল, তবে তাকেই বিয়ে করি না কেন?

তুলনা শুনিয়া বীণা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। যতই তাহার সুর্য্যিয়া চাকরের সমতল নাসা, সম্মার্জনীর ন্যায় গুম্ফ এবং আলুচেরা চোখ মনে পড়িতে লাগিল ততই তাহার হাসির উৎস উছলিয়া উঠিতে লাগিল। শেষে অনেক কষ্টে হাসি থামাইয়া একটু স্থির হইয়া বলিল, না দিদি, তোমায় ওঁকে বিয়ে করতেই হবে। তাহলে কেমন আমরা একসঙ্গে থাকবো।

আমার কিন্তু ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল। ইচ্ছা হইতেছিল গাছ হইতে নামিয়া গিয়া বলি, মহাশয়াদ্বয়, আপনাদের সৎপরামর্শ আমি শুনিয়া ফেলিয়াছি। এখন শীঘ্র এ স্থান হইতে পলায়ন করুন, নহিলে আসন্ন বিপদ।

সরস্বতী বীণার কথার উত্তরে হাসিয়া বলিল, আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে এখন। মা ডাকছেন শুনতে পাচ্ছিস?

বীণা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যাবে না?

সরস্বতী বলিল, তুই যা, আমি যাচ্ছি।

বীণা চলিয়া গেল। ঘাসের উপর তাহার পদশব্দ মিলাইয়া গেলে পর সরস্বতী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর সেই তৃণাবৃত ভূমির উপর নতজানু হইয়া বসিয়া যুক্ত করে গাঢ়স্বরে ডাকিল, ভগবান, বীণার আমার মঙ্গল কর। ছোট বোনটি যেন তার স্বামীকে পেয়ে সুখে থাকে।

গাছের উপর আমি স্তম্ভিত। আর একটু হইলেই পদস্থলন হইয়া পড়িয়া যাইতাম।

এমন সময় পদশব্দ। অনর্থ সম্ভাবনায় আমি শিহরিয়া উঠিলাম। অতি সাবধানে পা টিপিয়া টিপিয়া কে ঠিক গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। বুঝিতে বাকি রহিল না যে দাদা আসিয়াছেন। তাঁহার গায়ে কালো কোট, পায়ে বার্নিস পাম্পসু। পরিধানে কালাপেড়ে ধুতি—আগাগোড়া অভিসারের সাজ।

সরস্বতী চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কে?

দাদা একবার কাশিয়া গলা সাফ করিয়া একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, আমি।

তীব্রকণ্ঠে সরস্বতী বলিল, কে তুমি?

দাদা সশঙ্কে উত্তর করিলেন, আমি–কেদার।

সাশ্চর্যে সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এখানে-এত রাত্রে! বিস্ময় তাহার স্বাভাবিক লজ্জাকে পর্যন্ত অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

দাদা দ্বিধাকম্পিত স্বরে বলিলেন, কেন, তুমি–আপনি আমায় ডাকেননি?

সরস্বতী শুধু বলিল, আমি? আপনাকে?

দাদা ভীত হইলেন, বলিলেন, তবে এ চিঠি কার? চিঠি?

দেখি! বলিয়া সরস্বতী অগ্রসর হইয়া দাদার হাত হইতে চিঠিখানা লইল। একটু দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। তারপর চিঠি লইয়া ধীরপদে চলিয়া গেল। দাদা দাঁড়াইয়া রহিলেন, নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখেব।

আমার অবস্থা দাদার অপেক্ষাও শোচনীয় যেহেতু আমি গাছের উপর। শিথিল হস্ত হইতে গাছের ভাল ছাড়িয়া গেল। আমি পড়িয়া যাইতেছিলাম, হঠাৎ মনে হইল পড়াটা ভাল দেখায় না। তাই পতনকে লম্ফনে পরিণত করিয়া দাদার ঘাড়ের উপর পড়িলাম। দাদা সবেগে আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ছুটলেন। কিন্তু তখনি চেয়ারে লাগিয়া আছাড় খাইলেন। গড়াইতে গড়াইতে উঠিয়া আবার ছুটিলেন। এবার ভাগ্যের পরিহাস আরও নির্মম। একটা প্রাচীর তুলিবার জন্য খানিকটা কাদা তৈয়ারি করা ছিল। দাদা সেই কাদায় পড়িয়া

গড়াগড়ি খাইলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার পলায়নস্পৃহা কমিল না। কর্দমমুক্ত হইয়া দ্রুতগতিতে পলায়ন করিলেন।

অমূল্য শব্দ শুনিয়া আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে দু কথায় ঘটনাগুলি বুঝাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরিয়া দেখি দাদা আঙ্গুল হইতে নাকের ডগা পর্যন্ত কাদা মাখিয়া বসিয়া আছেন। এক পাটি জুতা ফিরিয়াছে—তাহাও ছিন্নভিন্ন। বড় বৌদিদি জল দিয়া কাদা ধুইয়া দিতেছেন, কিন্তু যত না কাজ করিতেছেন তাহার চতুর্গুণ হাসিতেছেন।

দাদা রাগিয়া বলিতেছেন, তুমি তো হাসবেই বৌদি।

কি যাতনা বিষে জানিবে সে কিসে
কতু আশীবিষে দংশেনি যারে!

আমার মত অবস্থা হলে বুঝতে পারতে।

এমন সময় আমি গিয়া উপস্থিত, বলিলাম, একি দাদা, তোমার এ মুর্তি হল কি করে?

বৌদিদি কষ্টে হাসি থামাইয়া বলিলেন, ষাঁড়ে তাড়া করেছিল! বলিয়াই আবার অপরিমিত হাসিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, ষাঁড়ে তাড়া? বল কি? আমাদের পাড়ার সেই কালো ষাঁড়টা বুঝি? ওটা যখন ভাল থাকে তখন বেশ থাকে। কিন্তু রাগলে আর রক্ষে নেই। আচ্ছা দাদা, ষাঁড়ে তাড়া করেছিল তো একটু আস্তে দৌড়লে না কেন? Shakespeare বলেছেন, They stumble that run fast!

দাদা দেখিলেন রাগ করা বৃথা। ক্রোধের শিখাকে যতই তিনি প্রদীপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, আমাদের হাসির উচ্ছাসে ততই তাহা নিভিয়া যাইতেছিল। নিরুপায় হইয়া দাদা ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলেন। বলিলেন, He laughs at scar that never felt a wound. তোমাকে ষাঁড়ে তাড়া করলে দেখব কেমন Shakespeare-এর উপদেশ মনে থাকে।

আমি বলিলাম, দুঃখের বিষয় আমায় কখনো ষাঁড়ে তাড়া করবে। কিনা তা কেউ জানে না। যদিই বা করে তুমি হয়তো তখন উপস্থিত থাকবে না। যাক, কিন্তু তুমি তখন কেন একটা গাছের ওপর উঠে পড়লে না?

দাদা একে আমাদের বিদ্রুপবাণে একটু কাবু হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার উপর মনের মধ্যে ঘোরতর একটা উত্তেজনা ছিল। তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন, গাছ থেকেই তো ষাঁড়টা– বলিতে বলিতে থামিয়া গেলেন।

আমি বলিলাম, কি রকম, গাছ থেকে ষাঁড় নামল? আজকাল কি ষাঁড়গুলো গাছে উঠতে আরম্ভ করেছে নাকি?

বৌদিদি কিন্তু এতক্ষণ হাসিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছিলেন।

দাদা বেফাঁস কথাটা বলিয়া ফেলিয়া বিষম বিপদে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সবঙ্গে ঘোর অস্বস্তির লক্ষণসকল স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তোয়ালে দিয়া গা মুছিতে মুছিতে বৌদিদির উদ্দেশ্যে বলিলেন, —

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলকুল কল নদীর স্রোতের মত।

শুধু হাসতেই জান।

কৌতুকছটা উছলিছে চোখে মুখে–

কেবল চালাকি করতেই পার। বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা তো আর কিছুই হল না। বলিতে বলিতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন।

4

রাত্রে বিছানায় শুইয়া যখন ঘটনাটি আগাগোড়া আলোচনা করিয়া দেখিলাম তখন ব্যাপার বড় কৌতুকপ্রদ বলিয়া বোধ হইল না। একজনকে জব্দ করিতে গিয়া ঘটনাচক্রে আমরাই জব্দ হইয়া গেলাম। এখন ঘোর সঙ্কট। সরস্বতী সেই কাল্পনিক প্রেম-কবিতা পড়িয়া যদি ঘুনাক্ষরে জানিতে পারে যে ইহা আমার কাজ তাহা হইলে অনর্থ ঘটিবে। দাদা এ কলঙ্ক হইতে উদ্ধার পাইলেও পাইতে পারেন, কিন্তু আমার নিষ্কৃতি নাই। দুশ্চিন্তায় আমার মাথার ভিতরটা আগুন হইয়া উঠিল। কিন্তু আত্মরক্ষার কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলাম না। ছিছি, করিয়াছি কি? একটি কুমারী মেয়ের সর্বনাশ করিতে বসিয়াছি? এখন যদি এই কথা কোনক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়ে, লোকে কি মনে করিবে? মুখে কিছু বলুক বা না বলুক মনে মনে নিশ্চয় ভাবিবে যে সরস্বতী সত্যই দাদাকে চিঠি লিখিয়াছিল। এখন দুনামের ভয়ে স্বীকার করিতেছে না। অথচ সে বেচারী নিষ্পাপ। আমি এই অপরাধের জন্য নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিলাম না। নিজের নিবুদ্ধিতার উপর সহস্র সহস্র অশনিসম্পাত কামনা করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি আমার ঘুম হইল না।

পরদিন বেলা প্রায় আটটার সময় দাদা যখন পাঠে মনোনিবেশ করিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও কৃতকার্য হইতেছিলেন না, তখন আমি গিয়া বলিলাম, দাদা, কাল কোন জায়গাটায় তোমায় ষাঁড়ে তাড়া করেছিল?

দাদা শুষ্কমুখে উত্তর করিলেন, ওই পুব দিকের মোড়ের ওপর।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, পাম্পসুও সেইখানেই হারিয়েছ, না?

উত্তরে দাদা শুধু ঘাড় নাড়িলেন।

তখন আমি কর্দমপরিপুষ্ট জুতার পাটিটা বাহির করিয়া বলিলাম, তাহলে এখান ক্ষিতীনবাবুর বাড়ির পিছনে কি করে গেল?

দাদার মুখ শুকাইয়া গেল। দুবার ঢেকে গিলিয়া বলিলেন, তইতো—কি করে গেল!

জুতাটা এককোণে ফেলিয়া দিয়া আমি তাঁহার সম্মুখে একটা চেয়ারে বসিয়া বলিলাম, মিথ্যে কেন আমার কাছে লুকোচ্ছ দাদা। তার চেয়ে আমার কাছে সব কথা খুলে বল না। আমি যদি কিছু করতে পারি। আমি কাউকে বলব না।

দাদা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর ভগ্নস্বরে বলিলেন, কাউকে বলিস না।

তারপর তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম এই : সরস্বতী তাঁহাকে এসেন্স মাখানো কাগজে কবিতায় চিঠি দিয়াছিল; সেই চিঠির নির্দেশ অনুসারে তিনি কাল রাত্রে সরস্বতীর বাড়ির পিছনে গিয়াছিলেন। সরস্বতীও সেখানে ছিল। কিন্তু চিঠির কথা শুনিয়া সে আকাশ হইতে পড়িল। তারপর চিঠিখানা লইয়া চলিয়া গেল। এমন সময় গাছ হইতে ইত্যাদি।

বিবরণ শেষ হইলে দাদা একটু বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন, Frailty, thy name is woman!

যতদূর বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক ততদূর বিস্মিত হইয়া গল্প শুনিতেছিলাম; এখন দাদার দুঃখে। বাস্তবিক দুঃখিত হইয়া বলিলাম, কেমন, প্রেমের নেশা ছুটেছে তো?

এইবার দাদা ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। সোজা হইয়া বসিয়া প্রদীপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, তুমি কুল করছি। সন্তোষ! তুমি মনে করছি আমি একটা অন্ধ মোহ বা আর কিছুর বশবর্তী হয়ে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়েছি। কিন্তু তোমার মত ভুল বোধহয় কেউ কখনো করেনি। তুমি কি মনে কর কাল তিনি আমায় প্রত্যাখ্যান করেছেন বলেই আমার সমস্ত প্রেম লুপ্ত হয়ে গেছে? না; বরং তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা শতগুণ বেড়ে গেছে। তাঁর এই শিক্ষা আমি জীবনে ভুলব না। তিনি শিখিয়েছেন যে ভালবেসে প্রতিদান চাইতে নেই। আমরা লেখাপড়া শিখেছি, বড় বড় আইডিয়া মনের মধ্যে ধারণা করতে চেষ্টা করি, কিন্তু একথাটা পূর্বে কখনো ভাবতে পারিনি। তার কারণ কি জান? কারণ-মানুষের মন বড় প্রবল-বড় স্বার্থপর! তাই একগুণ দিয়ে দশগুণ পেতে চায়। আর স্বার্থের মোহে সহজবুদ্ধিটুকুরও গলা টিপে ধরে। বলিতে বলিতে দাদার স্বরা যেন নিভিয়া আসিল।

আমার অত্যন্ত অনুশোচনা হইল। ইচ্ছা হইল সব কথা বলিয়া ফেলি। কিন্তু তাহাতে আরও বিপদ। সরস্বতী চিঠি লেখে নাই জানিতে পারিলে দাদার যন্ত্রণা যে কতদূর বাড়িয়া যাইবে তাহা বলা : একটা মন লইয়া বারবার কৌতুক করিতে ইচ্ছা হইল না। কারণ নিজের মনও খুব suস্থ ছিল না।

ঠিক সেই সময় বৌদিদি প্রবেশ করিয়া একটু যেন হাসি-হাসি সুরে বলিলেন, কি হচ্ছে তোমাদের ঠাকুরপো?

কথাগুল দাদাকেই সম্বোধন করা হইয়াছিল। তিনি কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, ও কিছু নয় বৌদি—

বৌদিদি হাস্যচঞ্চল চোখে ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিলেন, তবু শুনিই না।

বৌদিদির ধরন দেখিয়া বোধ হইল হয়তো দাদার উত্তেজিত বক্তৃতা শুনিয়াছেন। কিন্তু সহসা ধরা দেওয়া হইবে না। অথচ মেয়েমানুষের কাছে ঢিলা হইলেই ধরা পড়িবার ভয়। তাই একটু তীব্রকণ্ঠে বলিলাম, বললে কি বুঝতে পারবে বৌদি! এসব ফিলজফির কথা।

বৌদিদি এবার গভীর হইলেন, বলিলেন, তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে আমার ভালবাসা একটুও কমে যায়নি, ভালবেসে প্রতিদান চাইতে নেই,-এইসব বুঝি তোমাদের ফিলজফির কথা।

দাদা বুকে ঘাড় গুঁজিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া রহিলেন। আমিও মনে ভারি অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু তথাপি ছাড়িবার পাত্র নয়। বলিলাম, নিশ্চয়। মনের বৃত্তিগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করার শাস্ত্রই তো—

বৌদিদি মুখ আরও গভীর করিয়া বলিলেন, তবে ঠাকুরপো, তোমাদের ও শাস্ত্র পড়ে কাজ নেই। তোমরা ছেলেমানুষ, শেষে মাথা বিগড়ে যাবে।

আমি হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, দেখ, বৌদি, তোমার সবরকম ভণ্ডামি সইতে পারি। কিন্তু ওই গাম্ভীর মুখ সইতে পারি না। গাম্ভীর্য তোমার মুখে একটুও মানায় না।

বৌদিদিও হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন, বেশ মানি। কিন্তু মিথ্যে কথাও তোমাদের মুখে একটুও মানায় না-বলতে গেলেই ধরা পড়ে যাও। মেজ ঠাকুরপো যে জোরে বাগিতা করছিলেন, বাইরের ঘর থেকে বাবাও বোধহয় দুএক কথা শুনে থাকবেন।

দাদা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি ইঙ্গিতে তাঁহাকে শান্ত হইতে বলিলাম। কারণ বাবা যে কিছু শুনিতে পান নাই। ইহা নিশ্চিত! একবার মক্কেল-পরিবৃত হইয়া বসিলে বাজনাদিও তাঁহার কানে যাইত না।

বৌদিদি বলিলেন, এখন লক্ষ্মী ছেলের মত বলে ফেল তো ব্যাপারটা কি। আমার যতদূর সন্দেহ হয় কাল রাত্তিরের ঘটনার সঙ্গে এর কোন সংস্রব আছে।

দাদা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। কোনক্রমে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম, দাদা, মা ভৈঃ, বৌদিকে সব কথা বলে ফেলা যাক। তারপর যা হয় হবে। আর না বলেই বা কঃ পন্থা।

দাদা অগত্যা রাজী হইলেন। তখন আমি বৌদিদিকে টানিয়া আর একটা ঘরে লইয়া গিয়া সমস্ত খুলিয়া বলিলাম। নিজের দুস্কৃতির কথা কিছুমাত্র গোপন করিলাম না। সমস্ত শুনিয়া বৌদিদি গালে হাত দিয়া ভাবিতে বসিলেন।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, ঠাকুরপো, কাজটা ভাল হয়নি। সরস্বতী বড় চালাক মেয়ে, সে এ বিষয় নিয়ে গোলমাল করবে না। কিন্তু এ যে তোমার কাজ তা সে কবিতা দেখেই বুঝবে। সেটা কিন্তু ভাল হবে না ভাই। তার চেয়ে তুমি গিয়ে তার কাছে নিজের সমস্ত দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে এস। তাহলে সে সহজে তোমায় ক্ষমা করতে পারবে। আর তোমার দাদার কথা-সে। আমি আরো ভেবে দেখব।

ভাবিয়া চিন্তিয়া বৌদিদির কথামতই কাজ করা সমীচীন বোধ করিলাম। আরও মনে মনে স্থির করিলাম নিজের জন্য মার্জনা তো চাহিবই, সেই সঙ্গে দাদার মার্জনাটাও স্বীকার করাইয়া লইব।

বৈকালে আন্দাজ পাঁচটার সময় দাদাকে লইয়া বাহির হইলাম। বলিলাম, চল দাদা, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

দাদা উদাসভাবে বলিলেন, কোথায় যাবে?

আমি বলিলাম, চলই না। একটু নির্মল বায়ু সেবন করে আসবে।

দাদা আর আপত্তি করিলেন না। সময় সময় মানুষের মনের এমন অবস্থা হয় যখন কাহারও তুচ্ছ কথাটিরও প্রতিবাদ করিবার প্রবৃত্তি হয় না। অতএব আমরা দুজনে বাহির হইলাম।

যখন ক্ষিতীনবাবুর ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিলাম তখন দাদা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। আমি বলিলাম, ওকি, দাঁড়ালে কেন, চলে এস না।

দাদার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, এই বুঝি নির্মল বায়ু সেবনের জায়গা?

আমি কোনরকমে দাদাকে টানিয়া বাগান পার হইয়া বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বাড়িতে ঢুকিতেই বৈঠকখানা সম্মুখে পড়ে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ক্ষিতীনবাবু বাড়িতেই আছেন। পুরাতন বেয়ারা ভোলা একটু হাসিয়া বলিল, ভেতরে চলে যান না বাবু, আপনারি তো বাড়ি।

ছেলেবেলা কতবার বাড়ির ভিতর গিয়াছি। কিন্তু আজ অনেকদিন পরে কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। উপরন্তু দাদাকে লইয়া ভিতরে যাওয়া সঙ্গত নয়। অথচ তাঁহাকে বাহিরে একলা বসাইয়া রাখিয়া নিজে ভিতরে যাওয়াটাও কেমন লজাকের বোধ হইতে লাগিল। আমি ইতস্তত করিতেছি। দেখিয়া ভোলা বলিল, বাবু এই পাশের ঘরেই আছেন—আপনার ভেতরে যান।

আমরা ধীরে ধীরে পাশের ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটি খুব বড় নয়; তাহাতে সরঞ্জামের মধ্যে একটি খাট, একটি চেয়ার, একটি টেবিল এবং দেয়ালে কতকগুলি বিলাতী ছবি। প্রকৃতপক্ষে ঘরখানি ক্ষিতীনবাবুর দিবানিদ্রার জন্য; তবে অতিথি বন্ধুবান্ধব আসিলে সচরাচর এই ঘরখানি তাঁহাদের নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

আমরা প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ক্ষিতীনবাবু বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া আছেন। মাথার কাছে একটি পকেট ঘড়ি কুণ্ডলিত চেনের মধ্যে থাকিয়া টিক টিক শব্দ করিতেছে। বিছানার উপরেই কতকগুলি ইংরাজী ও সংস্কৃত বই ইতস্তত ছড়ানো। একটি বই খোলা অবস্থায় তাঁহার বুকের উপর পড়িয়া আছে। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম সেটির নাম বেদান্তবারিধিকর্ণধার। ঘরে অন্য কোন জনপ্রাণী ছিল না; কেবল একটা মাছি ক্ষিতীনবাবুর উরুর উপর বসিয়া কোন এক অনাগত শত্রুর উদ্দেশ্যে তাল ঠুকিয়া আস্ফালন করিতেছিল।

হঠাৎ তাঁহার বৈদান্তিক অনুশীলনে বাধা দিয়া হঠকারিতা করিলাম। কিনা ভাবিতেছি। এমন সময় ক্ষিতীনবাবু কড়িকাঠ হইতে দৃষ্টি নামাইয়া আমাদের দিকে চাহিলেন। আমাকে দেখিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, সন্তোষ না? এস, এস; ইনি কে?

দাদাকে তিনি পূর্বে অন্তত একশতবার দেখিয়া থাকিবেন। তথাপি এরূপ প্রশ্ন করায় দাদা অত্যন্ত মুষড়িয়া গেলেন। দার্শনিকের স্মৃতির উপর বিশেষ আস্থা না থাকায় ক্ষিতীনবাবু যে আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন এজন্য মনে মনে আশ্বস্ত হইলাম।

বলিলাম, ইনি আমার খুড়তুত দাদা-শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। কেন একে তো আপনি অনেকবার দেখেছেন।

ক্ষিতীনবাবু স্বপ্নবিষ্টের ন্যায় চক্ষু দাদার পানে ফিরাইয়া বলিলেন, তা হবে।

তারপর অনেকক্ষণ কোনও কথা হইল না। আমার বোধ হইল ক্ষিতীনবাবু অলক্ষ্যে আবার বেদান্তবারিধিতে ডুবিয়া গিয়াছেন। আমরা দুইটি প্রাণী যে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া আছি তাহা স্বচ্ছন্দে ভুলিয়া যাইতে একটুও দ্বিধা করেন নাই।

আমি একটু জোরে কাশিয়া ইতস্তত করিয়া বলিলাম, আমি একবার সরস্বতীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

ক্ষিতীনবাবু বলিলেন, সরস্বতী বাড়ির মধ্যে আছে।

সরস্বতীর বাড়ির মধ্যে থাকা সম্বন্ধে আমারও কোন সন্দেহ ছিল না। আমি ভাবিয়ছিলাম আমার উদ্দেশ্য জানিয়া ক্ষিতীনবাবু আমার ভিতরে যাইবার একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। কিন্তু সেরূপ কোন লক্ষণই না দেখিয়া অগত্যা একাই উঠিলাম। সরস্বতীর সহিত দেখা করিব শুনিয়া দাদা অত্যন্ত আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া ছিলেন। তাঁহাকে বলিলাম, একটু বস। আমি এখনি আসছি।

বাড়ির ভিতর পা দিয়াই দেখি সম্মুখে সরস্বতী। সে আমাকে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, একি সন্তোষদা! কতদিন পরে। ভাল আছ তো?

আমি ঢোক গিলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, তোমাকে দেখতে এলুম।

সরস্বতী পূর্বের মত সুন্দর হাসিয়া বলিল, আর কাউকে নয় তো?

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে চল—কথা আছে।

সরস্বতী চল বলিয়া আমাকে তাহার ঘরে লইয়া গেল। তারপর ঘরের দরজা ভেজাইয়া দিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিল, কি কথা?

আমি অপরাধীর মত তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। অবশেষে বলিলাম, সরস্বতী, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

সরস্বতী পূর্ববৎ রহস্যমুখর কণ্ঠে বলিল, কেন বল তো? আজকাল বড় বেশী কবিতা লিখছ সেই জন্যে। কবিতা লেখার কথা লইয়া আমাদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাসা চলিত। কিন্তু আজ আমি তাহার মুখের দিকে তাকাইতে পারিলাম না। নতমুখে বলিলাম, ঠাট্টা নয়। সরস্বতী, আমি সত্যিই ক্ষমা চাইতে এসেছি।

এবার সরস্বতী হাসিল না, শুধু জিজ্ঞাসা করিল, কি জন্যে?

আমি চকিতের জন্য মুখ তুলিয়া আবার তৎক্ষণাৎ নামাইয়া লইয়া বলিলাম, কি জন্যে তুমি জান না? বলিয়া ভয়ে ভয়ে আবার চোখ তুলিয়া দেখি, তাহার মুখের ভাব একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার চক্ষু হঠাৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কপাল উত্তপ্ত লোহার মত রাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। সে তীব্র কণ্ঠে বলিল, জানি। কিন্তু তোমরাও জান কি, যে অপমান আমায় করেছ তা মার্জনার কতদূর অযোগ্য?

আমি বাজাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। সরস্বতী তাহার প্রদীপ্ত চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া আবার বলিতে লাগিল। তাহার চক্ষুর ভিতর দিয়া যেন বিদ্যুৎ ছুটাছুটি করিতেছিল। আমি কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম।

সে বলিল, বুঝি না কি হীন তোমাদের প্রবৃত্তি। যখন কবিতায় চিঠি লিখতে বসেছিলে তখন মনে হয়নি যে একজন কুমারীর ইহকাল নষ্ট করবার পথ পরিষ্কার করছ। এই রকম প্রবৃত্তি নিয়ে তোমরা মনুষ্যত্বের দাবি করতে লজ্জা বোধ করা না। ছিছি, তোমরা মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাওনি কেন? এই পর্যন্ত এক নিশ্বাসে বলিয়া গিয়া থামিল। তারপর নিশ্বাস টানিয়া লইয়া আবার আরম্ভ করিল, বাহাদুরী তোমাদের প্রবৃত্তিকে আর বাহাদুরী তোমাদের অনুতাপকে। চিঠি লেখবার সময় এ জ্ঞান হয়নি? তাহলে তো ক্ষমা চাইবার জন্যে এত দূর আসতে হত না। ক্ষমা-ক্ষমা কি মুখের কথা নাকি।

আমার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছে দেখিয়া সরস্বতীর বোধহয় দয়া হইল; তাই সে চুপ করিল। আমি অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিলাম, সরস্বতী, আমি না বুঝে দোষ করেছি। আমাকে ক্ষমা কর ভাই।

গর্বিতভাবে গ্রীবা বাঁকাইয়া সে একটা অত্যন্ত কঠিন উত্তর দিতে যাইতেছিল। তাহার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। আমি সভয়ে তাহার দিকে তাকাইয়া ছিলাম। ঠিক যেমন আসন্নঅনলবর্ষ। আগ্নেয়গিরির চুড়ার দিকে চলচ্ছক্তিহীন মানুষ ভয়ব্যাকুলচক্ষে তাকাইয়া থাকে—সেইরূপ। কিন্তু হঠাৎ সরস্বতী থামিয়া গেল। তারপর ধীরে ধীরে আমার মুখের উপর হইতে তাহার রূঢ় উদ্ধত দৃষ্টি নামাইয়া লইল।

ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে উষ্ণ বাষ্প যেমন গলিয়া জল হইয়া যায়, সরস্বতীর মুখখানা দেখিতে দেখিতে সেইরূপ শান্ত হইয়া গেল। সে নতমুখে বসিয়া রহিল, তাহার কপালে গণ্ডে ছোট ছোট স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে সরস্বতী মুখ তুলিল। মুখখানা ঈষৎ রঞ্জিত হইয়াছিল। সে একটুখানি হাসিয়া বলিল, সন্তোষদা, তুমি এসেছিলে আমার কাছে একটা দৈবাৎকৃত ভুলের জন্যে ক্ষমা চাইতে। আমি কি চমৎকার ব্যবহারই তোমার সঙ্গে করলুম। এখন কে কাকে ক্ষমা করবে বলতো?

আমি সুদীর্ঘ এক নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, কাউকে কারুর কাছে ক্ষমা চেয়ে কাজ নেই সরস্বতী, ওটা কাটাকাটি হয়ে যাক।

সরস্বতী একটু মলিন হাসিয়া বলিল, সেই ভাল।

এমন সময় চাকরানি আসিয়া দ্বারের নিকট হইতে মৃদুস্বরে ডাকিল, দিদিমণি, মা তো এখনো ফিরে আসেননি। উনুনে আগুন দেব কি?

সরস্বতী বলিল, মোক্ষদা, ভেতরে আয় না। মার বোধহয় ফিরতে দেরি হবে-বীণাকে নিয়ে সেই ওপাড়ায় বেড়াতে গেছেন।–তুই এক কাজ কর না মোক্ষদা। উনুন জ্বেলে জল চড়িয়ে দে, তোর দাদাবাবুকে এক পেয়ালা চা তৈরি করে দি।

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, না না, অত হাঙ্গামে কাজ নেই–

মোক্ষদা পুরাতন দাসী, সরস্বতী বীণাকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছে। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিল, হাঙ্গামা কিসের? এই যে এখুনি করে দিচ্ছি। দাদাবাবু। বলিয়া চলিয়া গেল।

আমি বুঝিলাম সরস্বতী বাহ্য কাজের আড়ম্বরে আমাদের ভিতরকার লজ্জাটুকু চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি একটু ইতস্তত করিয়া বলিলাম, কিন্তু আর একজন নিরীহ প্রাণী যে তোমার মার্জনার আশায় বাইরে বসে আছেন।

কথাটা শুনিবা মাত্র সরস্বতী চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। চকিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কে?

কুণ্ঠিত স্বরে বলিলাম, দাদা।

সরস্বতীর মুখখানা সিঁদুরের মত রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তারপর নিজেকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া বলিল, যিনি আমাকে এত ছোট মনে করেন। তিনি আবার ক্ষমা চাইতে এসেছেন কেন?

তোমাকে ছোট মনে করেন?

সরস্বতী মাথা নীচু করিয়াই বলিল, তা নাহলে ও চিঠি আমার লেখা বলে মনে করলেন কেন?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। ভাবিলাম বলি-সরস্বতী, তুমি জান না যারা ভালবাসে তাদের মাঝে মাঝে কী প্রলোভনের সম্মুখীন হতে হয়। যদি জানতে এমন কথা বলতে না। কিন্তু কথাটা মনের মধ্যেই রহিল, বলা হইল না।

সরস্বতী হঠাৎ বলিল, যাই দেখিগে, মোক্ষদা কি করলে। বলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। আমি বলিলাম, না না। সরস্বতী, আমি এখন চা খাব না। কিন্তু তুমি বল, আমাকে যেমন ক্ষমা করেছি। দাদাকেও তেমনি করলে।

সরস্বতী কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। আমি নিরুপায় হইয়া বলিলাম, আর চিঠিখানা-সেখানা অন্তত দিয়ে যাও। তাও কি দেবে না?

সরস্বতী চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না, সে চিঠি তোমরা পাবে না। বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে আসিয়া দাদার মুখখানা একটু প্রফুল্ল দেখিলাম। ফটকের বাহির হইলে তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হল?

আমি নীরসভাবে বলিলাম, কিসের?

দাদা চুপ করিয়া গেলেন। আমি কিজান্য সরস্বতীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম তাহা তিনি কিছুই জানিতেন না। তবু বোধ করি প্রণয়ীর মনে একটা অনিশ্চিত আশা জাগিয়াছিল।

আমি তখন বলিলাম, নির্মল বায়ু সেবনে তোমার একটু উপকার হয়েছে দেখতে পাচ্ছি।

কি উপকার?

মুখের রং একটু ফরসা হয়েছে মনে হচ্ছে।

দাদা বুঝিতে না পারিয়া আমার মুখের পানে চাহিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ক্ষিতীনবাবুর সঙ্গে কি কথা হল?

দাদা সজাগ হইয়া বলিলেন, অনেক কথা। ওঁর কথা শুনে মনে হয়। উনি বেদান্ত নিয়ে বেশী নড়াচাড়া করেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন-আপনি বেদান্ত সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেছেন? আমি বললুম-কিছুদিন আগে একটু করেছিলুম। কিন্তু বেশী কিছু বুঝতে পারিনি। তিনি উৎসাহিত হয়ে বললেন—একবারেই কি বুঝতে পারা যায়। আর একটু চর্চা করে দেখুন সব পরিষ্কার হয়ে বাবে। —তারপরেই আমাদের কথাবার্তা জমে গেল।

আমি বলিলাম, ক্ষিতীনবাবু কেমন লোক বোধ হল?

দাদা বলিলেন, আগে তো কখনো ওঁর সঙ্গে আলাপ করিনি। তবে একবারে যত দূর বোঝা যায় খুব সরল প্রকৃতির লোক। আমার তো খুব চমৎকার লোক বলেই মনে হল।

আমি বলিলাম, তবে দোষের মধ্যে উনি বেদান্তকেই সমস্ত চিন্তার এবং কাজের কেন্দ্র করে। ফেলেছেন।

দাদা। আপত্তি করিয়া বলিলেন, সেটাকে দোষ বলতে পারি না। সকলেরই জীবনের একটা কেন্দ্র থাকা দরকার—তা নাহলে জীবনের বৃত্তটা সম্পূর্ণ হয় না।

আমি বলিলাম, বৃত্তটা খুব বেশী সম্পূর্ণ হলেও একটা বড় অসুবিধা আছে—কেবল বৃত্তপথেই ঘুরে বেড়াতে হয়—তার বাইরে কিছু আছে কিনা দেখবার ফুরসৎ হয় না।

দাদা বলিলেন, বাইরে দেখবার দরকার?

আমি বলিলাম, দেখ, নিরবচ্ছিন্ন সব জিনিসই একঘেয়ে হয়ে দাঁড়ায়। বৈকুণ্ঠে থেকে থেকে ভগবানের জীবন যখন নিতান্ত অসহ্য হয়ে ওঠে তখন তিনিও মর্ত্যে লীলা করতে আসেন।

দাদা বলিলেন, তবে তোমার মতে মানুষের জীবনের একটা কেন্দ্র থাকা উচিত নয়।

আমি তাঁহার প্রশ্ন এড়াইয়া বলিলাম, আচ্ছা, যে মুখে চিরকাল মিষ্টি কথা শুনে এসেছি সে মুখের কড়া কথা মাঝে মাঝে ভাল লাগে নাকি?

বেদান্তর হাওয়া তখনো দাদার মস্তিষ্কের কন্দরে কন্দরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তিনি জোর দিয়া বললেন, তা হলেও সত্যের কাছে কিছুই নয়।

আমি বলিলাম, দেখ, এটা তোমার বাড়াবাড়ি। আমি তোমার সঙ্গে আধ্যাত্মিক আলোচনা করছি না। আমি বলছি মনের ছোট ছোট বৃত্তিগুলির কথা—যার হাত থেকে কেউ কখনো নিস্তার পাননি। প্রমাণ চাও? রবিবাবুর রাজা ও রানী পড়। হে ব্রাহ্মণ, মিথ্যা করে বল; অতি ক্ষুদ্র সকরুণ দুটি মিথ্যা কথা!

তবু দাদা আমার কথা স্বীকার করিলেন না দেখিয়া আমি তাহার প্রাণের সবচেয়ে নরম স্থানে হাত দিলাম। বলিলাম, আচ্ছা একটা উদাহরণ ধর। মনে কর, একথা যদি সত্যি হয় যে সরস্বতী আদৌ তোমায় চিঠি লেখেনি, আর কেউ ঠাট্টা করে লিখেছে, তাহলে এই সত্যটা তোমার বেশী ভাল লাগে, না, সরস্বতী চিঠি লিখেছে। এই কল্পিত মিথ্যাটা বেশী ভাল লাগে। শুধু মনে করা—আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে বলছি না।

দাদার মুখ শুকাইয়া গেল। স্পষ্ট বুঝিলাম বৈদান্তিক গবেষণায় পরাজিত হইবার ভয়ে মুখ শুকায় নাই। তারপর দারুণ নৈরাশ্যপূর্ণ সুরে বলিলেন, তবে কি ও চিঠি সরস্বতীর নয়?

আমি হাসিয়া বলিলাম, আহাহা-শুধু মনে কর না ছাই। আমি কি তোমায় বিশ্বাস করতে বলছি?

দাদা একটু শান্ত হইয়া চিন্তা করিলেন। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; তিনি অর্ধস্ফুটস্বরে বলিলেন, তা কেমন করে হবে। নিশ্চয় সে লিখেছে। নইলে সে আসবে কেন?

আমি বলিলাম, কেমন, মানলে তো যে মিথ্যা মাঝে মাঝে সত্যের চেয়ে বেশী বাঞ্ছনীয়।

দাদা বলিলেন, কই মানলুম!

আমি বলিলাম, বাঃ, মানলে না? এখনি তো সরস্বতী চিঠি লেখেনি এই মনে-করা সত্যটা মিথ্যা বলে মানবার জন্যে প্রাণ আকুলি-বিকুলি করছিল।

দাদা সলজ্জে চুপ করিয়া রহিলেন।

5

কিছুদিন পরে একদিন দুপুরবেলা বৌদিদি সরস্বতীদের বাড়ি গিয়া সম্মুখে বীণাকে পাইয়া বলিলেন, কোথায় রে বীণা, তোর দিদি?

বৌদিদিকে দেখিয়া বীণা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, চল না ভাই বৌদি, আমার পুতুলের বাক্সটা গুছিয়ে দেবে।

বৌদিদি বলিলেন, সে হবে এখন। দিদি কোথায় তোর!

বীণা ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, নিজের ঘরে আছে। সকল সময়েই যে তাহার অপেক্ষা দিদির কাছেই বৌদিদির প্রয়োজন বেশী। ইহাতে তাহার অভিমান হইল।

ঘরে ঢুকিয়া বৌদিদি দেখিলেন সরস্বতী একলাটি চুপ করিয়া খাটের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। একজন ঘরে ঢুকিল দেখিয়া সে অন্যমনস্কভাবে মুখ তুলিয়া একটু ভ্রুকুটি করিল। তারপর চমক ভাঙ্গিয়া যাইতেই অপ্রতিভ ও লজ্জিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এই যে বৌদি-? বলিয়া আবার বসিয়া পড়িল।

বৌদিদি তাহার পাশে গিয়া বসিয়া কানে কানে বলিলেন, কার রূপ ধ্যান হচ্ছিল?

সরস্বতী চমকিয়া উঠিল। একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, বৌদি, আগে তো তুমি আমাকে এসব কথা বলে ঠাট্টা করতে না?

বৌদিদিও মনে মনে একটু লজ্জিত হইলেন। বীণা অভিমান সত্ত্বেও তাঁহার পিছন পিছন আসিয়াছিল, তাহাকে বলিলেন, তোর পুতুলের বাক্স নিয়ে আয় বীণা।

বীণা পুতুলের বাক্স আনিতে ছুটিল এবং অচিরাৎ তাহা লইয়া উপস্থিত হইল। তখন বৌদিদি তাহাকে বলিলেন, এখন তুই যা।।

বীণা আপত্তি করিয়া বলিল, বা রে-আমার পুতুল পড়ে রইল। এখানে—

বৌদিদি বলিলেন, বড় জার হুকুম। শিগগির পালা বলছি।

বীণা আর দ্বিরুক্তি করিল না, তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল।

তখন বৌদিদি একটা পুতুলের কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া নুতন করিয়া পরাইতে পরাইতে নতনেত্রে বলিলেন, সরস্বতী, আমি সব জানি।

সরস্বতী গলার স্বর সংযত করিতে করিতে বলিল, কিসের?

বৌদিদি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, তুই যা ভাবছিলি।

সরস্বতী একটা ঢোক গিলিল, তারপর সহজভাবেই বলিল, কি ভাবছিলুম?

বৌদিদি পুতুলটা বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া সহাস্যনেত্রে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তুই যত বড়ই পণ্ডিত হোস না কেন আমাকে ফাঁকি দিতে পারবি না। সত্যি বলতো তুই তার কথা ভাবছিলি না?

সরস্বতী স্বাভাবিক সুরে বলিল, কার কথা?

বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, ওলো, আমার গুণধর মেজ দেওরটির কথা।

সরস্বতী গম্ভীর হইয়া বলিল, না। বৌদি, তুমি ভুল বুঝেছি। আমি ওকথা ভাবছিলাম না।

বৌদিদি ম্লান হইয়া গেলেন; একটু পরে বলিলেন, তবে কি ভাবছিলে?

সরস্বতী বলিল, যা ভাবছিলুম তা অনেকটা ওই রকমই। ভাবছিলুম কি প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে।

বৌদিদি প্রজাপতি ঠাকুরের হাতেগড়া শিষ্যা। তিনি হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, এর প্রায়শ্চিত্ত যে ভরি সহজ! আ পোড়াকপাল, তাও বুঝি জানিস না?

সরস্বতী বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। তখন বৌদিদি তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া কানে কানে যাহা বলিলেন তাহার উত্তরে সরস্বতীর মুখখানা আকর্ণ লাল হইয়া উঠিল। সে বলিয়া উঠিল, আঃ বৌদি, কি যে বল তার ঠিক নেই-ছিঃ!

তাহার শেষ কথাটায় সত্যসত্যই একটু তিরস্কারের আভাস ছিল। সে নিজেকে বৌদিদির বাহুমুক্ত করিয়া লইয়া হেঁট মুখে বলিল, বৌদি, তুমি যা করতে চাও তা হবে না।

বৌদিদি তাহার দৃঢ়তায় আহত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন হবে না শুনি?

সরস্বতী কণ্ঠ স্থির করিয়া বলিল, এতে কেন নেই। আমি বলছি হবে না। বলিতে বলিতে তাহার গলাটা কাঁপিয়া গেল।

বৌদিদি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, আচ্ছা দেখিস আমার কথা। আমিও বলছি হবে। এই বলে গেলুম সরস্বতী, যদি অক্ষরে অক্ষরে না মিলে যায় তো বলিস তখন।

বাড়ি ফিরিয়া আসিলে বৌদিদির মুখখানা বড় বিষণ্ণ দেখিলাম। বলিলাম, কি হল?

বৌদিদি একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, সরস্বতী বড় শক্ত মেয়ে। সে যেটা অন্যায় মনে করে তাতে কোন প্রশ্রয় দেবে না।

আমি। তা তো জানিই। জানি বলেই তো তোমার মত লোককে পাঠিয়েছিলুম। এখন হল কি? পরাজয় নয় তো!

বৌদিদি। আর ভাই, প্রায় তাই বইকি।

আমি। অ্যাঁ! এ কিন্তু বৌদি, সরস্বতীর ভারি অন্যায়। একটা সামান্য অপরাধকে এমন বড় করে তোলা-এ কি তার উচিত হচ্ছে? বৌদি, তোমরা মেয়েমানুষ জাতটা ক্ষমা করতে জান না। তোমাদের দণ্ড আমাদের অপরাধের চেয়ে এত বেশী হয়ে পড়ে যে অসহ্য বোধ হয়।

বৌদিদি ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, অবশ্য এ কিছু মেমসাহেবের ব্যাপার নয় যে মেয়ের মত না হলে বিয়ে হতে পারে না। অনিলের মা মেজ ঠাকুরপোর মত জামাই পেলে খুশিই হবেন। কিন্তু, সরস্বতী যেরকম মেয়ে ও যদি একবার বেঁকে বসে-

আমি বলিলাম, না বৌদি, সে কাজ নেই। গৌরীন্দন তো নয় যে মেয়ের মত বলে কোনও জিনিসের সৃষ্টিই হয়নি। সরস্বতীর মন যদি দাদার প্রতি বিমুখ হয় তাহলে-বুঝলে না?

বৌদিদি ঘাড় নাড়িলেন, শেষে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, সত্যি বলছি ঠাকুরপো, তোমার নাদার মুখের দিকে চাইতে আমার কষ্ট হয়। খাওয়া-দাওয়া একেবারে কমে গেছে। সর্বদা মনমরা হয়ে বেড়াচ্ছেন।

আমি বলিয়া ফেলিলাম, সত্যি বৌদি, এই কদিন আমি দাদাকে লক্ষ্য করছি। উনি যেন কি রকম হয়ে গেছেন। ওঁর আমন স্বচ্ছ উজ্জ্বল প্রাণের ওপর যেন একপুরু কালি পড়ে গেছে। মুখে যাই বলি, যখন মনে হয় যে আমিই ওঁর ঘাড়ে এই অপরাধের ভার চাপিয়েছি, তখন কি বলব বৌদি, আমার চোখ ফেটে জল আসে।

বৌদিদির কোমল হৃদয়টি যে কত শীঘ্র গলিয়া যায় তাহা আমি জানিতাম। আমার কথা শুনিয়া তাঁহার চোখদুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; বুঝিলাম জল আসিয়াছে। কিন্তু তিনি রোদনের আভাসজড়িত মুখখানি হাসিতে ভরিয়া দিয়া বলিলেন, এই নাও ঠাকুরপো, আমি বাজি রাখলুম। আমি সরস্বতীর মন জানি, সে মুখে যাই বলুক না কেন। তাকে রাজী করাতে না পারি তো আমি তোমাদের শালী। এই বলিয়া বৌদিদি দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

6

বিকালবেলা দেখিলাম দাদা একখানা বই হাতে করিয়া বাহির হইতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি বই ওখানা?

দাদা পুস্তকের মলাট দেখাইলেন—উত্তর-মীমাংসা, ইংরাজীতে। অতিশয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হবে উত্তর-মীমাংসা?

দরকার আছে বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় ক্লাবে যাইতেছি, ক্ষিতীনবাবুর বৈঠকখানায় গৃহস্বামী ও দাদার স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া বৈঠকখানায় ঢুকিয়া পড়িলাম। দেখি, ঘোর তর্ক বাধিয়া গিয়াছে। তর্কের উত্তেজনায় দাদা একটা চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া আছেন। সম্মুখে কিয়দ্দূরে ক্ষিতীনবাবু উপবিষ্ট। তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল সংস্কৃত শ্লোক এবং তাহার তর্জমা বাহির হইতেছে। বাতির অভাবে ঘর প্রায় অন্ধকার। কিন্তু সেদিকে কাহারও ভ্রুক্ষেপ নাই। অন্ধকারে বসিয়া দুজনে মহোৎসাহে তর্ক করিতেছেন।

আমি ঘরে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু কেহই ফিরিয়া দেখিলেন না। তাহার কারণ আমি যে প্রবেশ করিয়াছি তাহা দুজনের একজনও জানিতে পারেন নাই। আমি তো দূরের কথা—সে সময় ইন্দ্রের সন্দেহ। ইহারা আমার কোন সংবর্ধনাই করিলেন না তখন সতাং মানে

স্থানে মরণমথবা দূরগমনং এই মহাবোক্য স্মরণ করিয়া সেখানে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলাম না-ক্লাব অভিমুখে ধাবিত হইলাম।

ক্লাবে পৌঁছিবামাত্র যে গুরুতর সংবাদটা অমূল্য পরম উৎসাহের সহিত আমাকে শুনাইয়া দিল তাহাতে সদ্যালক্ষিত দৃশ্যটা মনে করিয়া মন করুণায় ভরিয়া গেল। যেটা মুহূর্তপূর্বে খুব আশাপ্রদ বোধ হইয়াছিল এখন সেইটাই নিরাশার কালিমালিপ্ত হইয়া গেল।

অমূল্য যাহা বলিল তাহা এই—সরস্বতীর বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে, ভাবী বর মেয়ে স্বচক্ষে দেখিবার জন্য আজই প্রাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

সরস্বতীর বিবাহের সমস্ত ঠিক হইয়া গেল অথচ আমরা কিছু জানিতে পারিলাম না, ইহাতে আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। ভাবিলাম অমূল্য যতটা বলিতেছে ততটা কিছু নয়-বোধহয় সংকল্পিত বর কার্যগতিকে এদিকে আসিয়া পড়িয়া থাকিবে। তাই এই সুযোগে মেয়ে দেখিয়া যাইতেছে। সে যাহাই হোক, জিজ্ঞাসা করিলাম, লোকটি কে কিছু জান?

অমূল্য বলিল, অনিলের মা নাকি তাকে আবিষ্কার করেছেন। শুনছি তিনি ক্ষিতীনবাবুর শালার শালা।

এই অজ্ঞাতকুলশীল লোকটার উপর মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করে সে?

অমূল্য বলিল, এবার ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে বেরিয়েছে। নাম শরৎচন্দ্র ঘোষাল। এখানে তার, এক দূরসম্পর্কের মাসী আছেন।

প্রশ্ন করিলাম, কেমন দেখতে শুনতে? একটা খুঁত ধরিতে পারিলে বোধহয় আমার মনটা খুশি হইয়া উঠিত। কিন্তু অমূল্য বলিল, ভারি সুন্দর হে। আমি তাকে নিজে দেখেছি– বুদ্ধিমানের মত চেহারা। এখন দেখছ-তোমার দাদার কোন দিকেই আশা নেই। None but the brave deserve the fair.

বিকল অন্তঃকরণ লইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন সকালবেলা দাদাকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের এখানে একজন নতুন লোক এসেছে জান?

কে?

শরৎ ঘোষাল বলে একজন-কালই এসেছে।

কালই এক অদ্ভুত উপায়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে।

আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না; বলিলাম, কি রকম?

কাল প্রায় রাত্রি সাড়ে আটটার সময় আমি এই ক্ষিতীনবাবুর বাড়ি থেকে ফিরছিলুম। রাস্তা ঘোর অন্ধকার—হঠাৎ একজনের সঙ্গে মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। এরকম বেপরোয়া ভাবে যে নিজের মঘাটা অপরের মাথার সঙ্গে লড়িয়ে দেয়। তার ওপর রাগ হবারই কথা। বললুম-কে হে তুমি, কোন হ্যায়? লোকটি কাতর স্বরে বললে—মশায়, দোষ নেবেন না—আমি এখানে নতুন লোক। আর মাথাটাও আমার তেমন শক্ত নয়। আমি দেখলুম। গলা অপরিচিত। জিজ্ঞাসা করলুম-কে আপনি? তারপরই পরিচয় হয়ে গেল।

অন্ধকারে পরিচয়?

হ্যাঁ। কিন্তু লোকটি বেশ ভাল বলেই বোধ হল। তবে যেন একটু বেশী স্মার্ট।

কি করতে এসেছে জান?

ঠিক বলতে পারিনে। হাওয়া বদলাতে বোধ হয়।

হায় অজ্ঞ। দাদার জন্য প্রাণটা আনচান করিয়া উঠিল। কিন্তু তবু কি মুখ ফুটিয়া বলা যায়।

দিন দুই-তিন পরে বৌদিদি বলিলেন যে সরস্বতীকে দেখিতে আসিয়াছে—আজই কনে দেখা হইবে। বলিলাম, তবে সব শেষ।

বৌদিদি ম্লানমুখে উত্তর করিলেন, এখনো বলতে পারি না। তবে যতদূর বুঝতে পাচ্ছি—বোধ হয় শেষ।

দাদা কিছু জানেন?

না। এখনো জানেন না। জানাব?

খবরদার না। কাজটা চুপি চুপি শেষ হয়ে যাক।–তারপর তো জানতেই পারবেন।

বৌদিদি আর কিছু বলিলেন না।

বিকালবেলা দাদাকে একটু বিশেষ সাজসজ্জা করিয়া বাহির হইতে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় যাচ্ছ?

দাদা বলিলেন, শরৎ ডেকেছে-কোথায় নাকি যেতে হবে। এই কয়দিনে শরতের সহিত দাদার আলাপ বেশ গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

আমি একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিলাম। নিয়তি এত কঠিন পরিহাসও করিতে পারে!

সন্ধ্যার সময় ক্ষিতীনবাবুর বাড়ি উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম তাঁহার দিবানিদ্রার ঘর হইতে খাট ইত্যাদি অদৃশ্য হইয়াছে। তৎপরিবর্তে মেঝের উপর শুভ্র ফরাস পাতা। তাহার উপর কয়েকটা তাকিয়া ছড়ানো রহিয়াছে। পাড়ার দু চারিজন বয়স্ক ভদ্রলোক বসিয়া গল্প করিতেছেন; বরের পার্টি তখনো আসিয়া পৌঁছে নাই। আমাকে আজ ক্ষিতীনবাবু দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন, বলিলেন, এই যে সন্তোষ, বাড়ির ভেতর যাও। দেখগে যোগাড়-যন্ত্র হল কিনা।

আমি বড় দ্বিধায় পড়িলাম। সরস্বতীর সম্মুখে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না। শরতের সহিত যদি তাহার বিবাহ হয়, তাহা হইলে বিবাহের পূর্বে তাহার মনে কতকগুলা অপ্রীতিকর স্মৃতি জাগাইয়া লাভ কি?

তবু যাইতে হইল। সসঙ্কোচে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া দেখি দালানে বসিয়া অনিলের মা থালে থালে সন্দেশ সাজাইতেছেন এবং বীণা সন্দেশগুলোতে গোলাপের পাপড়ি বসাইতেছে। তাহার কোলে এক রাশি পাপড়ি।

আমি আবির্ভাব হইয়াই আবার তিরোভাবের চেষ্টা করিতেছি এমন সময় বীণা হঠাৎ মুখ তুলিয়া আমাকে দেখিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে গোলাপের পাপড়িগুলি মাটিতে ছড়াইয়া ফেলিয়া সে দুড় দুড় করিয়া ছুটিয়া পলায়ন করিল।

মাতা চাহিয়া আমাকে দেখিয়া একটু হাসিলেন, বলিলেন, সন্তোষ, এসেছ বাবা। আজ তোমাদেরই দেখবার শোনবার দিন। তোমরা না করলে কে করবে? ওই ঘরে একবার যাও।

ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বৌদিদি রহিয়াছেন। সরস্বতীকে সাজানো হইতেছে। সে নির্লিপ্তভাবে বসিয়া আছে, যেন তাহাকে সাজানো হইতেছে না। শুধু মাঝে মাঝে কিরকম ভাবে বৌদিদির মুখের পানে তাকাইতেছিল। বৌদিদি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু একটি কথাও না বলিয়া তিনি তাহাকে পরিপাটি করিয়া সাজাইতে লাগিলেন।

আমাকে দেখিয়া সরস্বতীর পাংশু মুখখানা হঠাৎ একবার লাল হইয়া উঠিয়াই আবার সাদা হইয়া গেল। সে জড়ের মত বসিয়া রহিল, নড়িল না। বৌদিদিও আমাকে দেখিয়া কোন কথা বলিলেন না।

বাহির হইতে সংবাদ আসিল বরের পার্টি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শুনিবা মাত্র সরস্বতী উঠিয়া দাঁড়াইল; বৌদিদির মুখের দিকে একবার চাহিল। বৌদিদি মুখ ফিরাইয়া লইলেন। সরস্বতী আমার দিকে চাহিল, তারপর দৃঢ়স্বরে বলিল, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে!

আমি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিলাম, আমি ওদের অভ্যর্থনা করিগে। অনিলকে ডেকে দিচ্ছি।

বাহিরে গিয়া দেখিলাম। বরপক্ষীয়গণ দ্বারের নিকটে সমাগত হইয়াছেন। তাঁহারা সংখ্যায় গুটি চার-পাঁচ। স্বয়ং বর, বরের কাকা এবং দুই-তিনজন বন্ধু। বরের কাকা আজই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন; তিনি এ পর্যন্ত আসিতে পারেন নাই বলিয়া কনে দেখা হয় নাই। বরের দুটি বন্ধুও কাকার সঙ্গে আসিয়াছেন।

আপাদমস্তক শুভ্রবেশ পরিহিত বর এবং তৎপক্ষীয়দের অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে আনিলাম। বরের চোখে পাঁশ-নে চশমা। বরের পশ্চাতে যে বন্ধুটি ছিলেন তাঁহাকে দেখিয়া মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি ভাবিয়াছিলাম, আসল উদ্দেশ্য জানিতে পারিলে নিশ্চয় দাদা শরতের সঙ্গে আসিবেন না। কিন্তু দাদা পাংশুমুখে একটুখানি মলিন হাসি লইয়া ঠিক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

বরপক্ষীয়েরা আসন গ্রহণ করিলেন। দাদা চুপি চুপি সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া একটি কোণে গিয়া বসিলেন।

বরের কাকা প্রবীণ ব্যক্তি-তিনি ক্ষিতীনবাবুর সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। বর ঘন ঘন স্খলিত চশমা নাসিকার উপর পুনঃস্থাপিত করিতে লাগিল। চারিদিক হইতে বরের চেহারার যে প্রশংসাগুঞ্জন উঠিতেছিল, সম্পূর্ণ অবিচলিত হইলেও বরটি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলিয়া বোধ হইল না।

সাদর সম্ভাষণ শেষ হইলে কন্যা আনিবার প্রস্তাব হইল। ক্ষিতীনবাবু স্বয়ং বাড়ির মধ্যে গেলেন এবং অল্পকাল পরে সুসজ্জিতা সরস্বতীকে বাহু ধরিয়া লইয়া আসিলেন। সরস্বতী

আসিয়া একটি টিপাইয়ের সম্মুখে দাঁড়াইল। আমি তাহার মুখের দিকে আড়চোখে একবার তাকাইলাম—কিছু বুঝা যায় না। শুধু তাহার ঠোঁটদুটি যেন ঈষৎ চাপা। একবার কোণের দিকে না তাকাইয়া থাকিতে পরিলাম না। দাদার মুখ শুষ্ক-চোখ নামাইয়া বসিয়া আছেন। আমি চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া বরের দিকে চাহিলাম। সে চশমার ভিতর দিয়া অনেকটা কুমীরের মত স্থির নেত্রে সরস্বতীর পানে তাকাইয়া আছে।

দেখা শেষ হইলে সকলে কন্যাকে ভিতরে লইয়া যাইতে বলিলেন। সরস্বতী তাহার আনত নেত্র একবার তুলিতেই হঠাৎ যেন কিসে লাগিয়া সজোরে প্রতিহত হইয়া গেল। তখনি সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ফেলিল। অনিল তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল।

বরকর্তা সভাস্থলেই স্বীকার করিলেন যে কন্যা রূপসী। এবং তাঁহার যে খুবই পছন্দ হইয়াছে তাহাও বারম্বার প্রচার করিতে লাগিলেন। তারপর হাস্যমুখে বলিলেন, মা-লক্ষ্মীকে তো দেখা হল। এখন বাবাজীকে একটু পরীক্ষা করে নিন।

ক্ষিতীনবাবু সাদরে বরের পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলিলেন, বাবাজীর আর পরীক্ষা কি? সব পরীক্ষাই তো উনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন।–আচ্ছা বাবাজী, তুমি উত্তর-মীমাংসা পড়েছ?

বর চশমার কাচ রেশমী রুমালে ঘষিতে ঘষিতে বলিল, উত্তর-মীমাংসা? আজ্ঞে না, উত্তর-মীমাংসা আমার পড়া নেই। তবে পশ্চিম–

বরের কাকা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, কি জানেন, ওরা তো আর্টস স্টুডেন্ট নয়, চিরকাল সায়েন্সই পড়ে এসেছে; তাই—

ক্ষিতীনবাবু ভাবী জামাতার পৃষ্ঠ হইতে হাতটি ধীরে ধীরে নামাইয়া লইলেন।

তারপরই বরপক্ষীয়গণ প্রভুত জলখাবারের ধ্বংস সাধন করিয়া হৃষ্টমনে বাড়ি ফিরিলেন। বরের কাকা প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে আশীর্বাদ তখনি সম্পন্ন হউক। কিন্তু সকলে বলিলেন যে ব্যস্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। বিশেষত বাবাজীর কন্যা পছন্দ হইল। কিনা এ বিষয়ে সম্যক না জানিয়া কার্য করা উচিত হয় না। অতএব স্থির হইল যে বাবাজীর সম্মতি লইয়া আশীর্বাদ শীঘ্রই সম্পাদিত হইবে।

7

একখানা বই মুখের সম্মুখে ধরিয়া দাদা কাৎ হইয়া বিছানায় শুইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মন ঠিক বইয়ের পাতার মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। খাোলা জানালা দিয়া অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছিল।

আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলাম, দাদা, রাতদিন পড়া কি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল? চল একটু বেড়িয়ে আসি।

দাদা উদাসভাবে বলিলেন, কই আর পড়া হচ্ছে—একজামিন তো এসে পড়ল।

আমি বলিলাম, তা হোক, চল একটু ঘুরে আসি!

দাদা কপালের উপর দিয়া দক্ষিণ করতল দুবার চালনা করিয়া বলিলেন, না ভাই, আজ থাক। শরীরটা তেমন ভাল নেই।

সেইজন্যেই তো আরও যাওয়া উচিত। এই কদিনে শরীরটাকে কি করে ফেলেছি, বল দেখি।

দাদা উঠিয়া দাঁড়াইলেন; নিজের বাহুর ম্লান পেশীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। এখনো বেশ শক্ত আছি।

একটা কামিজ গলাইয়া লইয়া দাদা আমার সঙ্গে বাহির হইলেন।

কিন্তু বেশী দূর যাইতে হইল না—অনতিপূর্বেই আমাদের গতিরোধ হইল।

স্বভাবের নিয়মে বিষম বিপর্যয় ঘটাইয়া, কি জানি কেন, আজ ক্ষিতীনবাবু স্বীয় কক্ষ বর্জনপূর্বক বাগানে বেড়াইতেছিলেন। দাদাকে তিনি দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং আমাকে আদৌ দেখিতে পাইলেন না। দাদাকে বলিলেন, কি হে, কোথায় যাচ্ছ?

দাদা সবিস্ময়ে বলিলেন, আজ্ঞে একটু বেড়াতে যাচ্ছি।

ক্ষিতীনবাবু আমার যৎপরোনাস্তি বিস্ময় উৎপাদন করিয়া বলিলেন, এ কদিন তোমায় দেখিনি যে? অসুখ করেছিল নাকি?

দাদা বলিলেন, আজ্ঞে না, বেশ আছি।

তখন ক্ষিতীনবাবু বলিলেন, তুমি সেদিন শঙ্করভাষ্য সম্বন্ধে যে বইখানা আমায় দিয়ে গিয়েছিলে আমি তার কয়েক জায়গায় দাগ দিয়ে রেখেছি। সেই দাগ দেওয়া জায়গাগুলো পড়লেই আমি যা বলেছিলুম সব বুঝতে পারবে।

দাদা যে আজ্ঞে বলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় ক্ষিতীনবাবু বলিলেন, বইখানা ইংরাজীতে হলেও চমৎকার লেখা। তোমার ওখানা আগাগোড়াই পড়া উচিত। লেখকের ইনট্রোডাকশন পড়েছ? পড়নি? এসো দেখিয়ে দিইগে। কি সুন্দর। আমি বোধহয় নিজের মত অত চমৎকার করে বলতে পারতুম না। বলিতে বলিতে তিনি বাড়ির দিকে ফিরিয়া চলিলেন।

দাদা আমার মুখের দিকে চাহিলেন, আমি দাদার মুখের চাহিলাম। ক্ষীণ হাসি দাদার ওষ্ঠ্যপ্রান্তে দেখা দিল। আমি ধীরে ধীরে তাঁহাকে ক্ষিতীনবাবুর দিকে ঠেলিয়া দিলাম।

দাদা নীরবে তাঁহার পশ্চাদ্বতী হইলেন। আমি ক্লাবে গেলাম।

সেদিন রাত্রি আটটা বাজিয়া গেলে দাদা চলিয়া আসিবার পর ক্ষিতীনবাবু অনেকক্ষণ বিছানায় চিৎ হইয়া শুইয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে আস্তে আস্তে দ্বার ঠেলিয়া সরস্বতী সেই ঘরে ঢুকিল। ক্ষিতীনবাবু একবার চাহিয়া দেখিলেন মাত্র। সরস্বতী দরজা ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া প্রথমে ঘরের চারিদিকে একবার ঘুরিয়া বেড়াইল। তারপর একটা কোণে গিয়া টিপায়ের উপর কতকগুলা খেলনা নাড়িতে নাড়িতে বেশ স্পষ্ট স্বরে বলিল, বাবা, তারা নাকি কাল আসবে?

ক্ষিতীনবাবু অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, কারা?

সরস্বতী জবাব দিল না; কিছুক্ষণ পরে বলিল, এ তো কিছুতেই হতে পারে না বাবা।

এতক্ষণে পিতার কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইল। তিনি ঈষৎ সজাগ হইয়া বলিলেন, কি হতে পারে না মা?

সরস্বতী লাল হইয়া উঠিয়া কোন রকমে বলিল, এ বিয়ে হতে পারে না বাবা।

ক্ষিতীনবাবু সবিস্ময়ে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, কেন?

সরস্বতী বুকে ঘাড় গুঁজিয়া বলিল, না। বাবা, এ কিছুতেই হতে পারে না।

ক্ষিতীনবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, এই দেখা পাগলামী। আচ্ছা তোর এসব কথায় থাকবার দরকার কি? তুই কি নিজে গিয়ে বিয়ে কচ্ছিস, না-

সরস্বতী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, বাবা, আমার এসব কথায় থাকবার দরকার হয়েছে। এই দেখ। বলিয়া পিতার সম্মুখে একখানা লেফাফা ফেলিয়া দিল।

ক্ষিতীনবাবু খাম খুলিয়া যাহা বাহির করিলেন তাহা একটি ফটোগ্রাফ। সরস্বতীর ভবিষ্যৎ স্বামীর আবক্ষ প্রতিকৃতি, নিম্নে দুই-ছাত্র কবিতা—যতদিন দেহে প্রাণ রহিবে আমি তোমারি, তুমি আমারি। ক্ষিতীনবাবু স্তব্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। সরস্বতী বলিল, নিজে পাঠিয়ে দিয়েছে।

কিছুক্ষণ দেখিয়া ক্ষিতীনবাবু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, তা বেশ তো। এতে আর দোষ কি মা?

সরস্বতী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, দোষ কি বাবা? একটা দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গে তুমি আমার—; এরকম করে যে নিজের ছবি পাঠাতে পারে তার সঙ্গে-বাবা, আমি বিয়ে করব না-ককখনো করব না। তুমি আমায় মেরে ফেল। বলিয়া সরস্বতী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সরস্বতী এতক্ষণ একটু একটু করিয়া খাটের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ক্ষিতীনবাবু তাহাকে টানিয়া নিজের কোলের কাছে বসাইলেন। পিঠে হাত দিয়া স্নেহ-কোমল স্বরে বলিলেন, কি হয়েছে মা বলতো। তাঁহার মত অন্ধ ব্যক্তিও যেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই অকিঞ্চিৎকর ফটোটাই শুধু তাঁহার কন্যার সুতীব্র মনস্তাপের হেতু নয়।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। সরস্বতীর বুকের মধ্যে কেন যে আজ হু হু করিয়া রোদনের অদম্য বেগ ছুটিয়া আসে সে নিজেই বুঝিতে পারে না। ক্ষিতীনবাবুও কন্যার এই নিদারুণ ব্যথার কারণ ঠিক জানিতে না পারিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যি সত্যি কি হয়েছে বলবি না মা?

মার কিন্তু মুখে কথা নাই। পিতা যতই কোমল প্রশ্ন করেন, মেয়ের বুকের মধ্যে কান্না ততই, গুমরিয়া উঠে। অনেক চেষ্টা করিয়াও ক্ষিতীনবাবু কিছুই জানিতে পারিলেন না।

সরস্বতী তেমনি ঘাড় গুঁজিয়া রহিল। তখন তিনি বলিলেন, আমি কালই তাদের বলে পাঠাব যে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেব না। তাহলে হবে তো?

সরস্বতী আস্তে আস্তে পিতার উরুর উপর মাথা রাখিয়া বাঁ হাত দিয়া নিজের চোখদুটা মুছিয়া ফেলিল।

ক্ষিতীনবাবু কতকটা নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন, ছোঁকরা দেখতে শুনতে তো মন্দ নয়, পড়াশুনোতেও ভাল। কিন্তু তবু কি জানি কেন আমার মনের ভেতরটা খুঁত খুঁত করছিল। —এই ধরনা কেন কেদারনাথ-ঐ যে ছেলেটি সন্তোষের কিরকম ভাই হয়— লেখাপড়ায় তেমন ভাল না। হলেও দিব্যি ছেলেটি-ঠিক আমার মনের মত— যেমন সরল, তেমনি বিনয়ী। এতটুকু বাবুয়ানী আর বিদ্যার প্রতি যথার্থ অনুরাগী। ওর মত একটি ছেলে পাওয়া যেত-তাহলে না হয় কি বলিস—

হঠাৎ মেয়ের দিকে দৃষ্টি পড়ায় তিনি নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন যে তাহার মুখখানা আগাগোড়া সিঁদুরের মত রাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। সে উঠিয়া আমি জানিনে বাবা বলিয়া একরকম দৌড়িয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ক্ষিতীনবাবু কিছুক্ষণ অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিলেন। তারপর গড়গড়ার নলটা আস্তে আস্তে তুলিয়া লইয়া শুধু বলিলেন–হুঁঃ-।

রাত্রে শুইতে গিয়া গৃহিণী স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমিই মেয়েদের আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছি। এমন কথাও শুনিনি কখনো। মা বাপে বিয়ে দেবে মেয়ে বলে বসল-ও বর বিয়ে করব না। তোর ওসব কথায় কাজ কি বাপু!

ক্ষিতিনবাবু চক্ষু মুদিত করিয়া শুইয়া রহিলেন। উত্তর না পাইয়া স্ত্রী আর একটু তীব্র কণ্ঠে বললেন, আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, অমন বর তোমার মেয়ের পছন্দ হল না কেন? জামাই মন্দটা কি? বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সুপুরুষ-অমন জামাই হাজারে একটা পাওয়া যায় না।

ক্ষিতীনবাবু আস্তে পাশ ফিরিয়ে বলিলেন, বেদান্ত না পড়লে আজকালকার ছেলেদের চরিত্র গঠন হয় না।

গৃহিণী রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, পোড়াকপাল বেদান্তের! আমার মাথা খাও যদি ওই বইগুলো রাতদিন পড়।

ক্ষিতীনবাবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই বলিলেন, কি করতে বল?

গৃহিণী বলিলেন, এ সম্বন্ধ ছাড়তে পাবে না।

ক্ষিতীনবাবু। ছাড়তেই হবে-উপায় নেই।

গৃহিণী। কেন?

ক্ষিতীনবাবু। ছেলেটির নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে।

গৃহিণী মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, বেদান্ত পড়েনি বলে বুঝি?

ক্ষিতীনবাবু জবাব দিলেন না। ভাবী জামাতার চরিত্র সম্বন্ধে একটা সন্দেহ আছে জানিয়া গৃহিণীরও মন হঠাৎ বিমুখ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, তা বেশ, যা হয় কর। কিন্তু তোমার মেয়েটি আর কচি খুকী নেই ভুলে যেও না যেন। আমি বলে দিচ্ছি, আর যা হয় কর কিন্তু ওইদিনে মেয়ের বিয়ে দেওয়া চাই। যেখান থেকে পার জামাই যোগাড় কর। এই বলিয়া কতক ক্ষুন্ন কতক বিষণ্ণ এবং কতক চিন্তান্বিত হইয়া গৃহিণী শয়ন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, তন্দ্রায় তাঁহার চক্ষু দুটি মুদিয়া আসিতেছে, এমন সময় ক্ষিতীনবাবু ডাকিলেন, ওগো।

গৃহিণী চোখ মেলিয়া বলিলেন, কি?

ক্ষিতীনবাবু। ও-বাড়ির সন্তোষের এক কিরকম ভাই আছে জান—কেদার বলে? সে জামাই হলে পছন্দ হয়?

গৃহিণীর ঘুম ভালরূপেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি বলিলেন, কে, সন্তোষের দাদা?

হ্যাঁ।

সে তো সন্তোষের চেয়ে নীচে পড়ে।

তাহলেই বা-ছেলেটি ভারি ভাল। আর তোমরা যা চাও, ঘরও চেনা টাকাকড়িও আছে।

গৃহিণী ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, সন্তোষের ভাই বলেই দিতে ইচ্ছে করে। বীণাটার যদি তেমন কপাল হয়, দুজনেই এক জায়গায় পড়বে।

ক্ষিতীনবাবু বলিলেন, তোমার মত আছে তো?

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, হঠাৎ ঐ ছেলেটিকে তোমার পছন্দ হল কেন বলতো? বেদান্ত পড়ে বলে, না? কি ভাগ্যি, আমায় যখন বিয়ে করেছিলে তখন তোমার বেদান্ত ছিল না, নইলে আমাকে তো বিয়েই করতে না।

যে ঘরে ক্ষিতীনবাবু শয়ন করিতেন তাহার। দুখানা ঘর পরে বীণা, ও সরস্বতী শুইত। আজ অনেক রাত পর্যন্ত তাহারা জাগিয়াছিল। খোলা জানোলা দিয়া চাঁদের আলো অন্ধকার ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়ছিল। ঠিক সেই আলোর কিনারায় দুই বোনে দুটি চেয়ারে বসিয়া ছিল।

ঠং ঠং করিয়া ঘড়ি বাজিল। বীণার ঘুম আসিতেছিল, সে সুপ্তি অলস কণ্ঠে বলিল, দিদি, এগারটা বাজল।

কথাটা দিদির কানে পৌঁছিল না। বীণা আবার বলিল, দিদি, শোবে না?

তখন দিদি বোনের তন্দ্রাজড়িত মুখের পানে চাহিল। তাহার চোখে সেই শান্ত জ্যোৎস্নালোকের মত এমন একটি মৃদু জ্যোতি ছিল যে তাহা নিদ্রালু বীণার চোখেও পড়িল।

সরস্বতী উঠিয়া বলিল, চল শুইগে। বলিয়া বীণাকে টানিয়া চাঁদের আলোর নীচে আনিয়া দুই বাহুতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া একটি চুম্বন করিল। বীণা দিদির বুকে মাথা রাখিয়া চুপটি করিয়া রহিল—কিছু জিজ্ঞাসাও করিল না।

সরস্বতী বীণার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া আর একবার বলিল, ঘুম পাচ্ছে, না বীণা? চল শুইগে। বলিয়া তাহাকে বিছানার দিকে লইয়া গেল।

৪

সেদিন রবিবার। দুপুরবেলা একলাটি বসিয়া পড়িতেছি এমন সময় বৌদিদি প্রবেশ করিয়া বলিলেন, ঠাকুরপো, কি দেবে দাও-বাজিমাত। তাঁহার গণ্ড হাস্যরঞ্জিত।

আমি লাফাইয়া উঠিয়া বলিলাম, অ্যাঁ, কি বলিলে বল দিদি শুনি গো আবার মধুর বচন।

বৌদিদি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলেন, আর মধুর বচন! তোমার বৌদিদিকে প্রণাম কর। তোমার বড়দাদা যদি একশটা বিয়ে করতেন তাহলেও এমন বৌদিদি আর পেতে না বলে দিলুম।

আমি সত্যসত্যই বৌদিদিকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, বেশ, তা না হয় প্রণাম করলুম। কথাটা খুলে বল। আমি যে ঠিক বুঝতে পারছিনে, কি কথা হায় ভেসে যায় ঐ চঞ্চল নয়নে।

বৌদিদি ঠানদিদিসুলভ গাম্ভীর্যের সহিত তাঁহার চম্পকাঙ্গুলি দ্বারা আমার চিবুক স্পর্শ করিয়া তাহা চুম্বন করিয়া বলিলেন, বেঁচে থাক। কথাটা হচ্ছে মেয়েমানুষের প্রতিজ্ঞা জগৎ শেঠের প্রতিজ্ঞার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।–

সাধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন–

আমি। ঐ তোমার ভারি দোষ বৌদি। তুমি একটা কথা সোজা করে কিছুতে বলতে পার না। ঐ জন্যেই তো দাদা তোমার ওপর অত রাগেন।

বৌদিদি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ওগো, এখন আর তিনি রাগবেন না–তা হাজার ঘুরিয়েই বলি না কেন।

বৌদি, এটা কি তোমার উচিত হচ্ছে?

কি?

আমাকে এরকম সংশয়ের যন্ত্রণা দেয়া?

বৌদিদি হাসিয়া আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, তবে শোন। আজ আমি বীণাদের বাড়ি গিয়েছিলুম। বীণার মা কি বললেন জান? কথায় কথায় হঠাৎ বললেন, শুনেছ বৌমা, সরস্বতীর যে সম্বন্ধ হয়েছিল। উনি তা ভেঙ্গে দিলেন। আমি অবাক হয়ে বললুম, সেকি মাসীমা? তিনি বললেন, ছেলেটি ওঁর তেমন পছন্দ হল না। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ বৌমা, তোমার দেওরটির সঙ্গে হয় না? আমি বললুম, কোন দেওর? তিনি বলিলেন, কেন গো, ঐ যে সন্তোষের খুড়তুত ভাই! ওঁর। কিন্তু ঐ ছেলেটিকে ভারি পছন্দ। আমি বললুম, মাসীমা, তা যদি হয় তাহলে আমরা আর কিছু চাই না। তিনি বললেন, তবে একবার চেষ্টা করে দেখ না বৌমা। আমরা তো বলবেই।

সত্য বলিতে কি এই কথা শুনিয়া আমার এত আনন্দ হইতেছিল যে ইচ্ছা হইতেছিল আবার বৌদিদির পায়ের ধূলা লই। কিন্তু সে প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া বলিলাম, আর বৌদি, সরস্বতীর সঙ্গে দেখা হল না?

বৌদিদি বলিলেন, হল না। আবার?

কি বললে সে?

বৌদিদি মুখখানি একটু রাঙ্গা করিয়া বলিলেন, সত্যি কথা বলব ঠাকুরপো, এই আমাদের মেয়েমানুষ জাতটা ভারি বাঁদর। সরস্বতীর কাছে গেলুম, মুখখানা এমন গোমড়া করে রইল যেন আমি কিছুই জানি না মনের মধ্যে কি হচ্ছে। আমি যখন গালটা টিপে দিয়ে বললুম, কি লো, মুখখানা অমন করে আছিস যে? তখন কিন্তু হেসে ফেললে আবার কেঁদেও ফেললে। বলিয়া হাসিতে হাসিতে বৌদিদির চোখেও জল আসিয়া পড়িল।

আমি উৎফুল্ল হইয়া বলিলাম, তবে সব ঠিক! বাকি শুধু পুরুত ডাকা?

বৌদিদি বলিলেন, তোমার দাদার কাছে কথাটা ভাঙ্গতে হবে। আগে।

আমি বলিলাম, তুমিই ভাঙ্গ।

দাদার ঘরে ঢুকিয়াই বৌদিদি বলিলেন, ঠাকুরপো, তোমার একটা সম্বন্ধ এসেছে।

দাদা চমকাইয়া উঠিলেন, তারপর বিরস স্বরে কহিলেন, চীনের রাজকন্যার সঙ্গে নাকি?

বৌদিদি বলিলেন, অত দূরে কি বিয়ে করতে আছে?

দাদা একটু হাসিয়া বলিলেন, তবে বুঝি মন্দোদরীর সহোদরার সঙ্গে?

না গো না, অত দূরে নয়। দাদা বলিলেন, তবে ভেঙ্গেই বল।

বৌদিদি বলিলেন, খুব কাছে—ওঃ ভারি কাছে। আন্দাজ কর।

দাদা। পারলুম না।

বৌদিদি। যদি বলি আমাদের পাড়ায় তাহলে পারবে তো?

দাদার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল, আবার তখনি অন্ধকার হইয়া গেল। তিনি ব্যথিত স্বর গোপন করিতে করিতে বলিলেন, তাহলেও পারলুম না বৌদি।

বৌদিদি আস্তে আস্তে বলিলেন, সরস্বতীর সঙ্গে।

দাদার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। কথাটা সহজে বিশ্বাস হইবার নয়। তিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আর শরৎ?

বৌদিদি বলিলেন, সরস্বতী তাকে বিয়ে করবে না, বলে দিয়েছে! সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেছে।

দাদার রক্তহীন মুখখানা অত্যন্ত শুষ্ক দেখাইতেছিল। তিনি বলিলেন, ঠাট্টা করছ বৌদি–?

তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি ঠাট্টা নয়, ঠাকুরপো। এই নিয়ে ঠাট্টা করব!

কিছুক্ষণ পরে দাদা ঘাড় তুলিলেন; আমি স্মিত মুখে বলিলাম,—

যদি অবহেলা করি রুষিবে সম্বর-অরি
কে সম্বরে স্মরশরে এ তিন ভুবনে!

এইবার দাদা সস্মিত ভর্ৎসনার চোখে আমার পানে চাহিলেন।

সেইদিন বিকালবেলা ঘটনাচক্রে শরতের সহিত দাদার দেখা হইয়া গেল। দেখা না হইলেই ভাল হইত। দাদা অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, শরৎ যে–ভাল তো?

শরৎ তাঁহার দিকে না তাকাইয়াই ভ্রূকুটি করিল। তারপর ভ্রূ তুলিয়া তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, কে? ওঃ ক্যাদারবাবু যে। বলিয়া ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিল।

দাদা অপরাধীর মত বলিলেন, এ কদিন তোমার ওখানে যেতে পারিনি–

শরৎ বিদ্রুপের হাসি হাসিয়া বলিল, তাতে আমার কোন ক্ষতি হয়নি। মিছিমিছি আপনাকে অ্যাপোলজি চাইতে হবে না।

শরৎ দাদাকে আঘাত দিবার জন্যই কথাটা বলিয়াছিল। দাদা চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে শরৎ মুখ তুলিল, তাহার ওষ্ঠে একটা ক্রুর হাসি খেলা করিতেছিল। সে বলিল, তারপর ক্যাদারবাবু, এবার পাসটাস হবেন তো? তা হতেও পারেন—আপনার ওপর সরস্বতীর কৃপা আছে। আর নেহাৎ যদি না হন—আমাকে একটা খবর দেবেন। আমি আপনার বন্ধু তো—একটা ঠিকেদারী জুটিয়ে দেব। ঠিকেদারী খাসা কাজ মশাই—দেদার ফুর্তি—

এই পর্যন্ত বলিয়া তীব্র ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া শরৎ হঠাৎ চলিয়া গেল। দাদা বিস্ময়ে ক্ষোভে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

1